এক নজরে বারি

www.bari.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

এক নজরে বারি

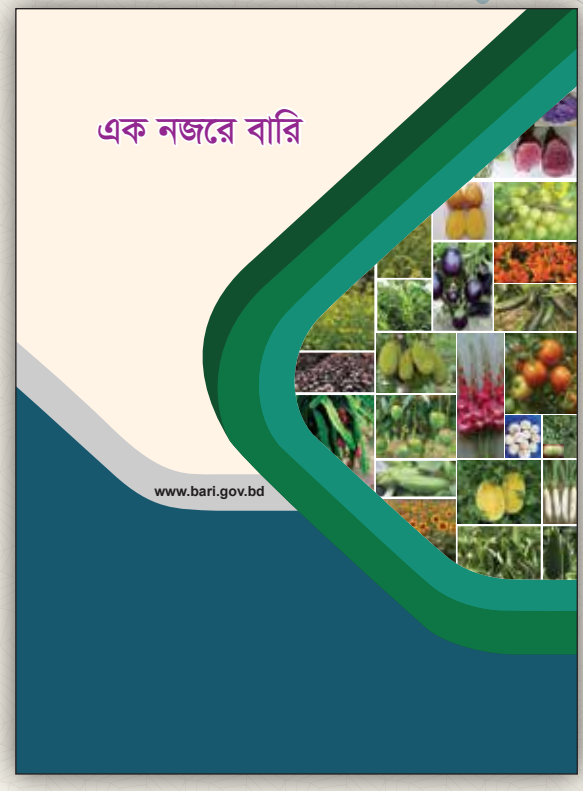

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশ সংখ্যা
নবম সংস্করণ
২,০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১, বাংলাদেশ

সংকলন ও সম্পাদনায়
ড. মুহা. আতাউর রহমান
ড. এ এইচ এম ফজলুল কবীর
ড. মো. বজলুর রহমান
ড. মো. মিজানুর রহমান
মো. হাসান হাফিজুর রহমান

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
লুবনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৫৬, ভজ হরি সাহা স্ট্রিট
নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এক নজরে বারি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার দানা জাতীয় শস্য, কন্দাল ফসল, ডাল, তেল ফসল, সবজি, ফল, ফুলসহ প্রায় ২১২টি ফসলের ওপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান এসব ফসলের উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ফসল ব্যবস্থাপনা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করে থাকে। উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষি সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মী ও কৃষকের নিকট হস্তান্তরের জন্য বিএআরআই কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিক ৮টি আঞ্চলিক ও ৩০টি উপকেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া বারির গবেষণা কার্যক্রম ৬টি বিশেষায়িত ফসলভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র যেমন- উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর; তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর; কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর; উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র, গাজীপুর; ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা ও মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া এবং ১৬টি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সরাসরি মূল্যায়নের জন্য সরেজমিন গবেষণা বিভাগের আওতায় ১২ (বার) টি খামার গবেষণা পদ্ধতি ও উন্নয়ন এলাকা (FSRD) এবং ৮৫ (পঁচাশি) টি বহুস্থানিক গবেষণা এলাকা (MLT) দেশব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইতিহাস শত বছরের পুরোনো। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির উপর ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা ফার্মের প্রতিষ্ঠা ছিল এ দেশে কৃষি ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উত্তোরণ। কিন্তু ১৯৬২ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক 2nd Capital প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা ফার্মের (বর্তমান শেরে বাংলা নগর) জমি অধিগ্রহণ করা হলে কৃষি গবেষণার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যদিও পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে ঢাকা থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরে ২৬০ হেক্টর জমিতে ঢাকা ফার্ম স্থানান্তরিত হয়। এরপর কৃষি বিভাগের নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হলেও তা দেশের মানুষের চাহিদা মেটাতে ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দক্ষ জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় স্থাপনার অভাব এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় কৃষি সেক্টরেও উন্নতির অমিত সম্ভাবনা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর পর দেশকে

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ প্রতিষ্ঠানটি সর্বতোভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

বিএআরআই-এর ম্যান্ডেট

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৫ অনুযায়ী বিএআরআই এর ম্যান্ডেট নিম্নরূপ:

ধান, পাট, চা, তুলা ও চিনি জাতীয় ফসল ব্যতীত অন্যান্য সকল ফসলের (দানাদার ফসল, কন্দাল ফসল, তৈলবীজ ফসল, ডাল ফসল, ফুল, ফল, সবজি ফসল, মসলা ফসল ইত্যাদি) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী:

(ক) গবেষণার বিষয়াবলীর বিস্তৃত রূপরেখা প্রণয়ন ও অনুমোদন;

(খ) ইনস্টিটিউটের 'ম্যান্ডেটে' উল্লেখিত ফসলসমূহের নতুন জাত উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন উৎপাদন প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কৃষি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(গ) কৃষি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্যাবলী সরবরাহ করা;

(ঘ) কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, প্রকল্প এলাকা ও খামার স্থাপন করা;

(ঙ) ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন ও তার পরিচর্যার উপর পরীক্ষণ ও প্রদর্শনী পরিচালনা করা;

(চ) ফসল গবেষণা ও ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন, কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, সংবাদ সাময়িকী ও অন্যান্য বইপত্র প্রকাশ করা;

(ছ) ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(জ) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

(ঝ) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্বাচিত সমস্যাবলী সম্পর্কে মত বিনিময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উদ্ভাবনের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;

(ঞ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ট) কৃষিতে জীব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ফসলের জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

(ঠ) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

(ড) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি, সাপ্লাই এবং ভ্যালুচেইন, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঢ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের নতুন জাতের প্রজনন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ণ) কৃষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ করা;

(ত) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধানের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএআরআই এর সম্পর্ক রয়েছে: গবেষণা ও উন্নয়নের স্বার্থে বিএআরআই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিএআরআই এর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তা হলো : সিমিট (CIMMYT), মেক্সিকো; আইআইটিএ (IITA), নাইজেরিয়া; ইকার্ডা (ICARDA) সিরিয়া; ইকরিস্যাট (ICRISAT), ভারত; সিআইপি (CIP) পেরু; আইসিএআর (ICAR), ভারত; কিমা (CLIMA), অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

অর্থ যোগানদানকারী সংস্থাসমূহ: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিংহভাগ ব্যয়ভার বহন করে থাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এছাড়া, প্রকল্প সাহায্য/অনুদান হিসেবে বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হয় ইনস্টিটিউটের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। সাহায্যকারী দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে: (ক) যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID), (খ) বিশ্বব্যাংক (WB), (গ) জাপান সরকার, (ঘ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), (ঙ) ফোর্ড ফাউন্ডেশন, (চ) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র (IDRC), (ছ) কানাডিয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CIDA) (জ) বিশ্ব খাদ্য কৃষি সংস্থা (FAO) এবং (ঝ) IPM-CRSP-ABSP-ii (যুক্তরাষ্ট্র)।

বারি উদ্ভাবিত জাতসমূহ

ফসলের নাম	বিগত তিন বছরের উদ্ভাবন			এযাবৎ মোট উদ্ভাবন
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
দানা ফসল	২	৩	১	৮৮
তেল ফসল	৪	২	২	৫৫
ডাল ফসল	০	১	১	৪৫
কন্দাল ফসল	১২	৯	৬	১৫০
সবজি ফসল	২	২	৫	১৩৬
ফল ফসল	৩	৩	১	১০৪
ফুল ফসল	৩	০	১	২৬
মসলা ফসল	২	৬	৩	৫৯
অন্যান্য	২	১	১	১৪
মোট	৩০	২৭	২১	৬৭৭

বারি উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ

প্রযুক্তির নাম	বিগত তিন বছরের উদ্ভাবন			এযাবৎ মোট উদ্ভাবন
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
শস্য, মৃত্তিকা, পানি এবং রোগ পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপন	১৪	১২	১৯	৩০৭
কৃষি যন্ত্রপাতি	১	০	১	৫১
সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা	০	১	০	৩৮
শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা	০	১	০	৩৪
সরেজমিন গবেষণা	৮	৯	৯	২০৫
জীব প্রযুক্তি	২	২	০	৩০
অন্যান্য	১	৩	৪	৮
মোট	২৫	২৮	৩৩	৬৭৩

শস্য আবাদ অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনা

ধান	৭৬.১৫%
গম	২.২১%
ভুট্টা	৩.১৫%
আলু	৩.০৮%
শর্করা	৮৪.৫৯%
ডাল	২.৩৮%
তেল	৩.১৯%
মসলা	২.১৯%
সবজি	২.৯৯%
ফল	২.৭০%
আখ (ইক্ষু)	১.২২%
পাট	৪.৫৩%
চা	০.৪০%

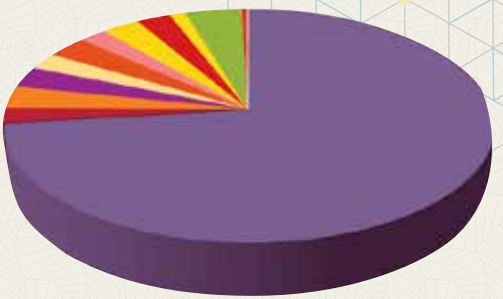

শুধুমাত্র **১৩.৫%** জমি ডাল, তেল, মসলা, সবিজ এবং ফল আবাদ হয়।

বিবিএস, ২০২০

বারি উদ্ভাবিত ফসলের কৃষক পর্যায়ে গ্রহণ (আবাদ অনুযায়ী)

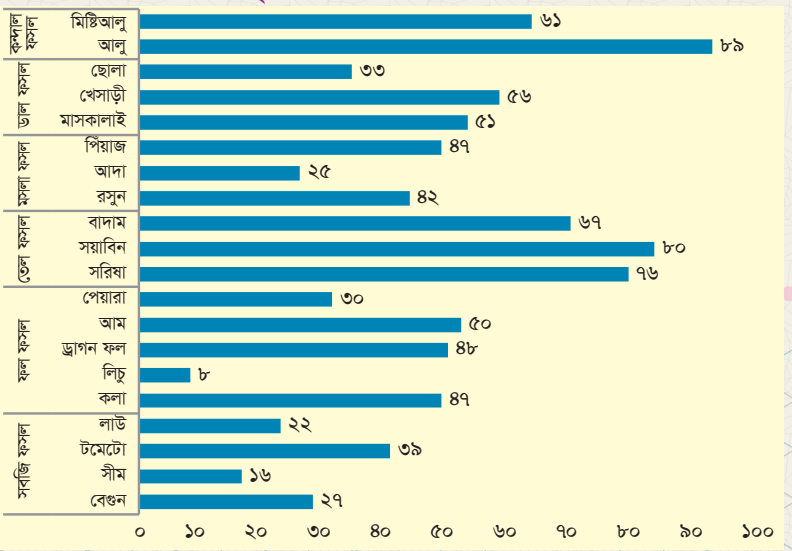

পদকসমূহের নাম ও প্রাপ্তির বৎসরঃ

ক্রমিক নম্বর	পুরস্কার/সম্মাননা/পদকের নাম	বৎসর
১.	বঙ্গবন্ধু গোল্ড মেডেল	১৯৭৪
২.	প্রেসিডেন্ট মেডেল	১৯৭৯
৩.	বেগম জেবুননেসা এবং কাজী মাহাবুবুল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট গোল্ড মেডেল	১৯৮২
৪.	ওমেন্স সাইনটিস্ট এসোসিয়েশন গোল্ড মেডেল (আন্তর্জাতিক পুরস্কার)	১৯৯০
৫.	স্পেশাল প্রাইজ	১৯৯০
৬.	বেগম জেবুননেসা এবং কাজী মাহাবুবুল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট গোল্ড মেডেল	১৯৯৫
৭.	দ্যা রোটারো হাশিমতো এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এপিএফইডি) অ্যাওয়ার্ড ফর গুড প্রাকটিস (আন্তর্জাতিক পুরস্কার)	২০০৮
৮.	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (১৪১৭ বঙ্গাব্দ)	২০১২
৯.	স্বাধীনতা পুরস্কার	২০১৪
১০.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কৃষি পদক	২০১৪
১১.	কেআইবি কৃষি পদক	২০১৬
১২.	ব্র্যাক ম্যাঙ্গন ডিজিটাল ইনোভেশন পদক	২০১৬
১৩.	ফুডফ্লুয়েন্সার অব দ্যা ইয়ার পদক	২০২৩

বারি'র পক্ষে ফুডফ্লুয়েন্সার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ। *(২০২৩ খ্রি.)*

অর্গানোগ্রাম

মহাপরিচালক
পরিচালক
সেবা ও সরবরাহ
প্রশাসন
অর্থ ও হিসাব
সংগ্রহ ও ভাণ্ডার
ভূমি ও ইমারত
সাধারণ সেবা
পরিচালক
গবেষণা
গবেষণা কেন্দ্র (৬)
গবেষণা বিভাগ (১৬)
আঞ্চলিক কেন্দ্র (৮)
উপ কেন্দ্র (৩০)
এফএসআরডি সাইট (১২)
এমএলটি সাইট (৮৫)
পরিচালক
প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ
এএসআইসিটি
প্রশিক্ষণ
যোগাযোগ
সম্পাদনা ও প্রকাশনা
গ্রন্থাগার
ডিসপ্লে ও ফটোগ্রাফি
পরিচালক
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
পরিকল্পনা
মূল্যায়ন
পর্যবেক্ষণ
প্রতিবেদন
পরিচালক
কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
পরিচালক
উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
পরিচালক
ডাল গবেষণা কেন্দ্র
পরিচালক
তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র

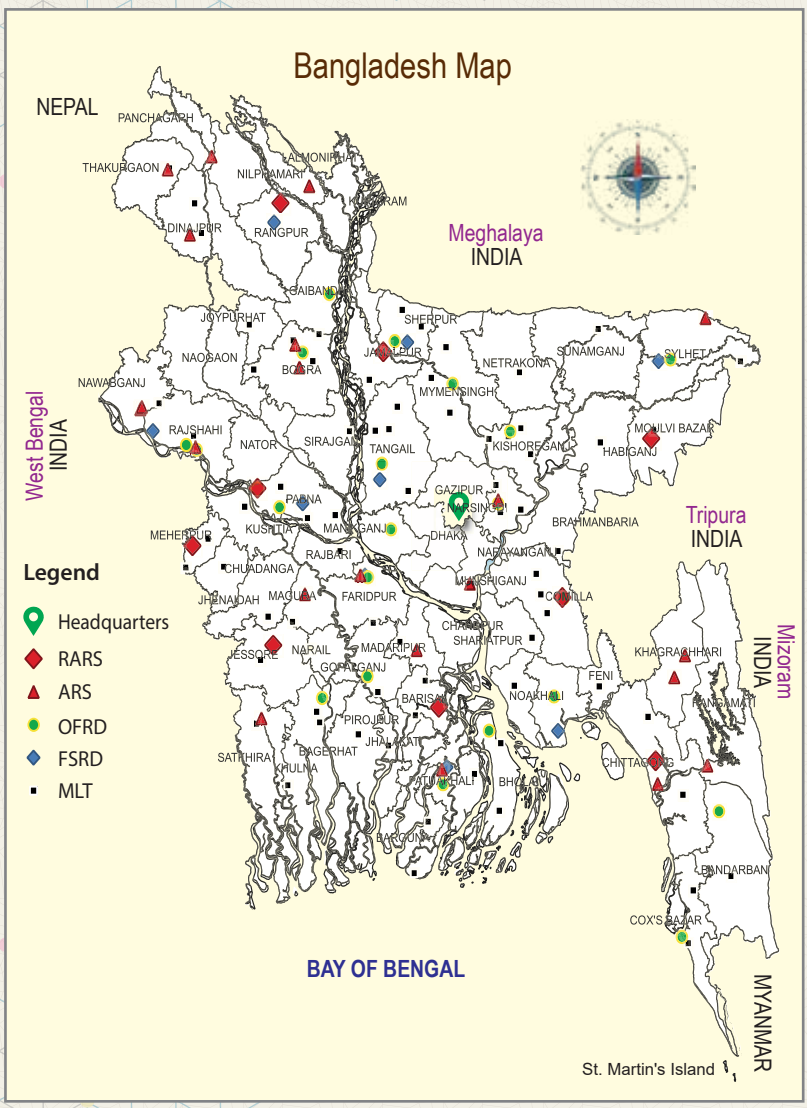

Bangladesh Map
NEPAL
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
DINAJPUR
RANGPUR
Meghalaya
INDIA
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETRAKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSINGH
West Bengal
INDIA
RAJSHAHI
NATOR
SIRAJGANJ
TANGAIL
KISHOREGANJ
MOULVI BAZAR
HABIGANJ
GAZIPUR
PABNA
NARSINGDI
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
BRAHMANBARIA
Tripura
INDIA
MEHERPUR
RAJBARI
NARAYANGANJ
CHUADANGA
MUNSHIGANJ
JHENAIDAH
MAGURA
FARIDPUR
COMILLA
CHANDPUR
SHARIATPUR
JESSORE
NARAIL
MADARIPUR
GOPALGANJ
KHAGRACHHARI
FENI
INDIA
Mizoram
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
PIROJPUR
JHALAKATI
SATKHIRA
BAGERHAT
KHULNA
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BHOLA
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
BAY OF BENGAL
MYANMAR
St. Martin's Island
Legend
Headquarters
RARS
ARS
OFRD
FSRD
MLT

বারি আলু-১০১

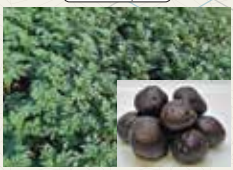

বারি আলু-১০৪

বারি কাসাভা-৪

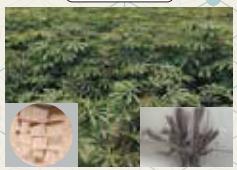

বারি মিষ্টিআলু-১৮

বারি পানিকচু-৯

বারি মেটেআলু-৭

বারি সাহেবীকচু-১

বারি সূর্যমুখী-৩

বারি সেফ-১ (কুসুম ফুল)

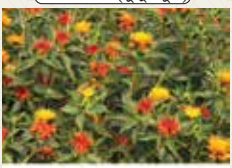

বারি সরিষা-২৩

বারি চীনাবাদাম-১২

বারি তিল-৬

বারি সীউইড-২

এরোফনিক কালচার

বারি আলুবোখারা-১

বারি পেঁয়াজ-৫

বারি পেঁয়াজ-৬

বস্তায় আদা চাষ

বারি কফি-২

কাজু বাদামের অগ্রবর্তী লাইন

বারি মটর-৪

বারি মসুর-৯

বারি মুগ-৬

বারি ছোলা-১১

বারি চিয়া-১

বারি ওট-১

বারি বার্লি-১০

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র

বারি সোলার পাম্প

বারি আম-৪

বারি আম-১৩

বারি আম-১৮

বারি জামরুল-৩

বারি কাঁঠাল-৬

বারি বাতাবিলেবু-৫

বারি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি

বারি পেয়ারা-৪ (বীজ বিহীন)

বারি লিচু-৩

বারি মাল্টা-১

বারি ড্রাগন ফল-১

বারি অ্যাভোক্যাডো-১

বারি আঁশফল-২

বারি শিম-১

ভাসমান বেড পদ্ধতিতে শসা চাষ

বারি স্কোয়াশ-১

বারি টমেটো-২৩

বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-২

বারি মুলা-১

বারি লাউ-৬

বারি বিটি বেগুন-৪

বারি বেগুন-১২

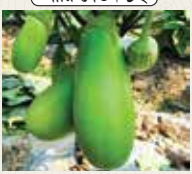

বারি লিলিয়াম-৩

বারি গ্লাডিওলাস-৬

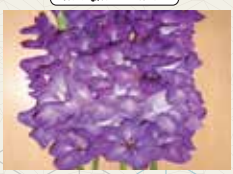

বারি ক্যাকটাস-১

কন্দাল ফসল গবেষণা

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল আলুর জাত কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ আলু চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের চাহিদা পুরণ করেও প্রচুর পরিমাণে আলু বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। চাষাবাদের দিক থেকে বাংলাদেশে ধান ও গমের পরেই আলুর অবস্থান। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাতের নামকরণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বেই আলুর ১০টি বিদেশি জাত চাষের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ১১টি জাত, সিআইপি জার্মপ্লাজম থেকে ৬টি জাত, বিদেশি জাত মূল্যায়নের মাধ্যমে ৪৮টি জাত এবং ২টি টিপিএস জাত সহ ১০৪টি আলুর জাত কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে।

বারি আলু-৯২

বারি আলু-১০০

বারি আলু-১০১

বারি আলু-১০৪

মিষ্টিআলু

বিএআরআই এ পর্যন্ত ১৮টি মিষ্টিআলুর জাত অবমুক্ত করেছে, এদের মধ্যে কয়েকটি উচ্চ ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ দৈনিক হলদে/রঙ্গিন শাঁসযুক্ত মাত্র ১৩ গ্রাম মিষ্টিআলু খেলে ভিটামিন এ-এর চাহিদা পূরণ হয়। বারি মিষ্টিআলু-৬, বারি মিষ্টিআলু-৭, বারি মিষ্টিআলু-৯ লবণাক্ত সহনশীল অপর দিকে বারি মিষ্টিআলু-৮ খরা সহনশীল ও খেতে খুব সুস্বাদু। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টিআলুর অন্যান্য জাতগুলি হলো- বারি

মিষ্টিআলু-১০, বারি মিষ্টিআলু-১১, বারি মিষ্টিআলু-১২, বারি মিষ্টিআলু-১৩, বারি মিষ্টিআলু-১৪, বারি মিষ্টিআলু-১৫, বারি মিষ্টিআলু-১৬, বারি মিষ্টিআলু-১৭ এবং বারি মিষ্টিআলু-১৮। এ জাতগুলি হেক্টরপ্রতি ৪০-৫০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

বারি মিষ্টিআলু-১৭ এর লতা ও কন্দ

বারি মিষ্টিআলু-১৮

বারি মিষ্টিআলু-১৪ জাতটির পাতা খাঁজ কাটা, কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ। গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি। কন্দের ওজন ৬৬০ গ্রাম ও আকার লম্বাটে। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৯২ মি.গ্রা. এবং প্রায় দুই মাস সংরক্ষণ করা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪০ টন, জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৪.১২±১%।

বারি মিষ্টিআলু-১৫ পাতা খাঁজ কাটা নয়, কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ। গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি। কন্দের ওজন ৬৮৩ গ্রাম ও আকার লম্বাটে ও অনিয়মিত। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মি.গ্রা. এবং দুইমাস সংরক্ষণ করা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪০ টন, জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২২.৩৯±১%। বারি মিষ্টিআলু-১৬ বিটা ক্যারোটিন এবং বারি মিষ্টিআলু-১৭ এন্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ যার আঁশের রং গড় বেগুনী। বারি মিষ্টিআলু-১৮ বিটাক্যারোটিন সমৃদ্ধ। যার শাসের রং কমলা এবং শুষ্কতা ২৩.৪৫%।

কচু

বিএআরআই এ যাবৎ মুখি কচুর ৩টি এবং পানিকচুর ৯টি জাত অবমুক্ত করেছে। বারি মুখীকচু-১ (বিলাসী) ও বারি পানিকচু-১ (লতিরাজ) খেতে খুবই সুস্বাদু ও বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। সমগ্র বাংলাদেশে খরিফ মৌসুমে চাষের উপযোগী বারি মুখীকচু-১ (বিলাসী) জাতের গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারি লম্বা। মুখী খুব মসৃণ, ডিম্বাকৃতির হয়। সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু। সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায়। জীবনকাল ২১০-২৭০ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ টন। বারি পানিকচু-১ (লতিরাজ) এর লতি লম্বায় ৯০-১০০ সেমি, সামান্য চ্যাপ্টা, সবুজ, লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ এবং গলা চুলকানি মুক্ত হয়। জীবনকাল ২৫০-৩০০ দিন। গড় ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর লতি, ১৮-২২ টন/হেক্টর রাইজোম। বারি পানিকচু-৭ হেক্টর প্রতি ফলন ৬০-৭৫ টন রাইজোমও ২৮-১১ টন লতি উৎপন্ন হয়। বারি পানিকচু-৮ এর লতি তুলনামূলক মোটা এবং খাটো, সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়। বারি পানিকচু-৯ এর

বারি মুখীকচু-৩

বারি পানিকচু-৯

গাছপ্রতি লতি ২৫-৩৫টি এবং গড় ওজন ৮০০-৯০০ গ্রাম। এছাড়া বারি বিজ্ঞানীরা সাহেবীকচুর ১টি, মেটেআলুর ৭টি, ওলকচুর ২টি, কাসাভার ৪টি জাতসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। যার অনেকগুলো কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত।

বারি ওলকচু-১

বারি কাসাভা-৪

বারি মেটেআলু-৫

বারি মেটেআলু-৭

বারি সাহেবীকচু-১

বাংলাদেশে এরোপনিক্স পদ্ধতিতে মানসম্পন্ন বীজ আলু (মিনি-টিউবার) উৎপাদন

আলু চাষের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে রোগমুক্ত মানসম্পন্ন বীজ আলুর সহজ প্রাপ্যতা। বর্তমানে দেশে মানসম্পন্ন বীজ আলুর চাহিদা প্রায় ৮-১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এ চাহিদার বিপরীতে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মিলে মাত্র ১০-১২% মানসম্পন্ন বীজ আলু সরবরাহ করতে সক্ষম। ভাইরাস ও অন্যান্য রোগবালাই মুক্ত মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন করতে আধুনিক ও জীব প্রযুক্তির বিকল্প নেই। তাই আধুনিক ও জীব প্রযুক্তির (টিস্যু কালচার) মাধ্যমে উন্নত মানের বীজ আলু উৎপাদন করে এদেশের বীজ আলুর আমদানি নির্ভরতা যেমন কমিয়ে আনা সম্ভব, তেমনি দেশে উদ্ভাবিত উন্নত জাতসমূহের বীজ দ্রুত কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াও সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বীজ আলু উৎপাদন করছে। যদিও তা চাহিদার তুলনায় নগন্য। প্রচলিত পদ্ধতিতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত রোগমুক্ত প্লান্টলেট থেকে নেট হাউজে মাটিতে মিনি-টিবার উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত মিনি-টিবারের সংখ্যা ও ফলন অনেক কম। তাছাড়াও মৃত্তিকা বাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে। এরোপনিক্স এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোন রকম মাটির স্পর্শ ছাড়াই উদ্ভিদকে কোন একটি প্লাটফর্মে স্থাপন করে শিকড় বায়ুতে ঝুলিয়ে খাদ্যোপাদান মিশ্রিত পানির দ্রবণ ধুমায়িত পদ্ধতিতে নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শিকড়ে স্প্রে করে ফসল উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিতে গাছের শিকড় সম্পূর্ণ বায়ুবীয় আবস্থায় থাকায় শিকড় পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পায় ফলশ্রুতিতে ফসলের ফলনও বৃদ্ধি পায় ও মাটি বাহিত রোগের আক্রমণ থেকে গাছ রক্ষা পায়। এরোপনিক্স পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো- ১) প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় দশ গুন বেশি ফলন, ২) রোগমুক্ত ও মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, ৩) বছরে ২-৩ টি ফসল চক্রাকারে করা সম্ভব, ৪) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিহীন উৎপাদন, ৫) লবণাক্ততা ও খরা প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণায়, ৬) উলম্ব কৃষির গবেষণায়, ৭) ক্রমান্বয়ে চয়নের কারণে অধিক উৎপাদন ও বীজের আকার নিয়ন্ত্রণ, ৮) নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন, ৯) গাছের বৃদ্ধি ও রোগবালাই দমনে বায়ো-এজেন্টের সহজ ব্যবহার ও ১১) খাদ্যোপাদান ও পানির সর্বনিম্ন ব্যবহার।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এ সারা বছরব্যাপী এরোপনিক্স পদ্ধতিতে রোগমুক্ত ও মানসম্পন্ন মিনি-টিউবার উৎপাদন

তৈলবীজ গবেষণা

বাংলাদেশে তৈলবীজ ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তৈলবীজ ফসলের উৎপাদন চাহিদার মাত্র এক তৃতীয়াংশ। ভোজ্য তেল তথা তৈলবীজের চাহিদা পূরণের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সয়াবীন ও সূর্যমুখী প্রধান তৈলবীজ ফসল। অদ্যাবধি বিএআরআই কর্তৃক সরিষার ২৩টি, চীনাবাদামের ১২টি, তিলের ৬টি, সয়াবিনের ৭টি, সূর্যমুখীর ৩টি, তিসির ৩টি, গর্জন তিল এবং কুসুম ফুলের ১টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সরিষার জাতের মধ্যে বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ এবং বারি সরিষা-১৭ (ব্রাসিকা রাপা) উচ্চ ফলনশীল (১.৪-১.৮ টন/হেক্টর), স্বল্পমেয়াদী (৮০-৮৫দিন) এবং রোপা আমন-সরিষা-বোরোধান শস্য বিন্যাসের জন্য উপযোগী। অধিকন্তু বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ এবং বারি সরিষা-১৭ এর বীজের বর্ণ হলুদ হওয়াতে তেলের পরিমাণ বাদামী বর্ণের সরিষার তুলনায়

বারি সূর্যমুখী-৩

বারি সয়াবিন-৭

বারি তিল-৬

বারি সেফ-১ (কুসুম ফুল)

বারি সরিষা-১৮

বারি সরিষা-২৩

৩-৪% বেশি থাকে। ২০১৮ সালে উদ্ভাবিত জাত বারি সরিষা ১৮ এর গড় ফলন ২.০-২.৫ টন/হেক্টর, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%, জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। জীবনকাল কম হওয়ায় ধান ফসলের সাথে রিলে ফসল হিসাবে চাষ করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এ জাতের তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ১.০৬%, সরিষা গাছের উচ্চতা ৮৮-১২৬ সে.মি.। জাতটি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম 'ক্যানোলা' বৈশিষ্ট্যের। ২০১১ সালে বারি সরিষা-১৯ এবং ২০২২ সালে বারি সরিষা-২০ অবমুক্ত করা হয়। ২০২৪ সালে অবমুক্ত বারি সরিষা-২১ জাতটি হলুদ বর্ণের ও দুই প্রকোষ্ট বিশিষ্ট। বীজ তেলের পরিমাণ ৪০%, ফলন ১.৫৩-২.৪০ টন/হেক্টর। ২০২৫ সালে অবমুক্ত করা হয় বারি সরিষা-২২ এবং ২৩। জাতটিতে তেলের পরিমাণ যতাক্রমে ৪১.২৩% এবং ৪৪%।

বারি চীনাবাদাম-৫, বারি চীনাবাদাম-৬, বারি চীনাবাদাম-৭, বারি চীনাবাদাম-৮ ও বারি চীনাবাদাম-৯ উচ্চ ফলনশীল (২.৫-২.৮ টন/হেক্টর) এবং সারাদেশে চাষাবাদের উপযোগী। বারি উদ্ভাবিত চীনাবাদামের সর্বশেষ জাত বারি চীনাবাদাম-১২ স্বল্প মাত্রায় খরা ও রোগ সহনশীল।

বারি তিল-৩ এবং বারি তিল-৪ উচ্চ ফলনশীল (১.৪-১.৫ টন/হেক্টর)। বারি তিল-৪ জাতটি তিল উৎপাদন এলাকা ছাড়াও মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী। বারি তিল-৫ জাতের বীজ সিঙ্গেল কোট বিশিষ্ট যা বিদেশে রপ্তানি যোগ্য। এছাড়াও বারি তিল-৬ এর শুটিতে বীজের সংখ্যা ৫০-৮০টি এবং বীজাবরণ গাঢ় কালো বর্ণের।

বারি চীনাবাদাম-১১

বারি চীনাবাদাম-১২

ডাল ফসল গবেষণা

ডাল বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদজাত আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য। স্বল্প পরিচর্যা ও বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে ডাল চাষ করা যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি স্বল্পতা দূর করতে, মাটির হারানো উর্বরা শক্তি ফিরে পেতে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে, সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ডালের আবাদ বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি। এখানে বিএআরআই উদ্ভাবিত কয়েকটি ডাল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মসুর

মসুর ডাল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমিষ সমৃদ্ধ ও সুপাচ্য খাদ্য উপাদান। বাংলাদেশে ডাল ফসলের এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে এবং এদেশের ভোক্তা পছন্দের দিক হতে এটির স্থান প্রথম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত মসুরের ৯টি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। তন্মধ্যে বারি মসুর-৪, বারি মসুর-৫, বারি মসুর-৬, বারি মসুর-৭ এবং বারি মসুর-৮ উচ্চ ফলনশীল এবং মরিচা ও ষ্টেমফাইলিয়াম রোগ প্রতিরোধী হওয়ায় কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বারি মসুর-৫ ও বারি মসুর-৬ অবমুক্ত করা হয়েছে ২০০৬ সালে, যাদের পরিপক্কতার সময় ১১০-১১৫ দিন এবং হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২১০০-২২০০ কেজি। বারি মসুর-৭ অবমুক্ত করা হয় ২০১১ সালে। জাতটির গাছের ধরন ঝোপালো, ফুলের রং হালকা বেগুনী, পরিপক্কতার সময় ১১০-১১২ দিন এবং হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২.২-২.৩ টন। বারি মসুর-৮ ২০১৫ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। এজাতটি ষ্টেমফাইলিয়াম ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং দেরিতে বপন যোগ্য (৩ নভেম্বর পর্যন্ত) ফলন ২.২-২.৩ টন/হেক্টর। একক ফসল হিসেবে চাষাবাদ ছাড়াও রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল হিসেবে চাষ অত্যন্ত লাভজনক প্রযুক্তি হিসেবে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বারি মসুর-৭

বারি মসুর-৯ জাতটি ২০১৮ সালে অবমুক্ত হয়েছে। জাতটি নাবী হওয়ায় আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সহজে চাষ করা যায়। জাতটির গড় ফলন ১,২০০-১,৫২০ কেজি/হেক্টর, জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন। জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল। ১০০ বীজের ওজন ২.২২-২.৯৬ গ্রাম।

জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রি.	মে	জুন

আমন ধান

বারি মসুর-৯

বোরো ধান

ফসল ধারা: আমন ধান-মসুর-বোরো ধান

মুগ

বাংলাদেশের সুস্বাদু ডাল ফসলের মধ্যে মুগ অন্যতম। বর্তমানে চাষাবাদের এলাকা এবং উৎপাদন বিবেচনায় এটি তৃতীয় স্থান দখল করেছে। খরিফ-১, খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমে ডাল ফসলের মধ্যে একমাত্র মুগডালই প্রায় সারাবছর চাষ করা যায়। অন্যান্য ডাল ফসলের তুলনায় মুগডাল চাষে সময়ও কম লাগে (৫৫-৭৫ দিন)। সেজন্য মুগডালকে সহজেই বিভিন্ন শস্য বিন্যাসে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। এছাড়াও মুগডাল অপেক্ষাকৃত খরা ও আর্দ্রতা সহিষ্ণু। সময়মতো বপন করতে পারলে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণও অনেক কম হয়। সব মিলিয়ে ডালের এ বিরাট ঘাটতি পূরণে মুগডাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মুগ ডালের ৮টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তন্মধ্যে বারি মুগ-৫ ও বারি মুগ-৬, বারি মুগ-৭ এবং বারি মুগ-৮ স্বল্পকালীন, বীজ আকারে বড়, হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহিষ্ণু ও উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সারাদেশে প্রায় ৮০ ভাগ মুগের আবাদী জমিতে বারি উদ্ভাবিত বারি মুগ-৫ এবং বারি মুগ-৬ চাষাবাদ হয়ে থাকে। ১৯৯৭ সালে বারি মুগ-৫ অবমুক্ত করা হয়। যার জীবনকাল ৬০-৬৫ দিন এবং ফলন হেক্টরপ্রতি ১৩০০-১৫০০ কেজি। বারি মুগ-৬ বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত জাত। এর বীজের আকার অন্যান্য জাত অপেক্ষা বড়, গাছের আকার খর্বাকৃতি (৪০-৪৫ সেমি) এবং জীবনকাল ৫৫-৫৮ দিন। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে ৮০-৯০% ফল একসাথে পাকে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১,৫০০-১,৬০০ কেজি। ২০১৫ সালে বারি মুগ-৭ এবং বারি মুগ-৮ অবমুক্ত করা হয়েছে, উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী এবং স্বল্পমেয়াদি এ জাত দু'টি কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি মুগ-তিল আন্তঃফসল হিসেবে চাষাবাদ এবং থ্রিপস ও ফলছেদক পোকা দমনের জন্য উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বারি মুগ-৬

ছোলা

ডাল ফসলের এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে ছোলা বাংলাদেশে সপ্তম স্থান দখল করে আছে। ছোলার ফল ছেদক পোকা ও বোট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগের কারণে ব্যাপকভাবে ছোলা উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও ছোলার জীবনকাল ৪ মাসের অধিক হওয়ায় রবি

মৌসুমে অন্যান্য ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারার কারণে ছোলার আবাদী জমিতে অন্যান্য ফসল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত ছোলার ১১টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

উদ্ভাবিত জাতসমূহের মধ্যে বারি ছোলা-৫ ও বারি ছোলা-৯ ধরনের উচ্চফলনশীল ও রোগসহনশীল জাত। এছাড়া বারি ছোলা-৮ একমাত্র কাবুলী জাত। ছোলার এ জাতসমূহ একক ফসলের পাশাপাশি আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করে লাভবান হওয়া যায়। বারি ছোলা-৫, ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির। গাছের উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি। জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন এবং ফলন হেক্টর প্রতি ১,৮০০-১,৯০০ কেজি। বীজ আকারে ছোট হওয়ায় কৃষক এবং ভোক্তাসাধারণের নিকট জাতটি অনেক জনপ্রিয়। ২০১১ সালে বারি ছোলা-৯ জাতটি অবমুক্ত হয়। গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি এবং গাছের রং সবুজ, পত্র ফলকগুলি বেশ বড় এবং বীজের আকার বড়। জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন এবং ফলন হেক্টর প্রতি ১,৮০০-২,০০০ কেজি। এ জাতটি খাড়া প্রকৃতির হওয়ায় বোট্রাইটিস গ্রে মোল্ড এবং ফল ছেদক পোকার প্রাদুর্ভাব কম হয়। বারি ছোলা-১০, ২০১৭ সালে এবং বারি ছোলা-১১, ২০১৮ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। জাতটি তাপ ও হরা সহিষ্ণু, রোগ প্রতিরোধী এবং উচ্চ ফলনশীল (১.৮-২.০৩ টন/হেক্টর। দেরীতে বপন করা যায় (মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত), জীবনকাল ১১২-১২১ দিন।

বারি ছোলা-৯

বারি ছোলা-১০

বারি ছোলা-১১

মাসকলাই

বাংলাদেশে ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। গ্রীষ্মকালে চাষযোগ্য ও খরা সহিষ্ণু হওয়ায় মাসকলাই বাংলাদেশের চাষীদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া দেশের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাইয়ের ৪টি উন্নত জাত হল- বারি মাস-১, বারি মাস-২, বারি মাস-৩ এবং বারি মাস-৪। বারি উদ্ভাবিত এ জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ে আবাদ করে দেশে ডালের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। বারি উদ্ভাবিত

বারি মাস-৩

বারি মাস-৪

বারি মাসকলাই-৩ জাতটি ১৯৯৬ সালে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয় যেটি খরিফ-১ এবং খরিফ-২ দুই মৌসুমেই চাষাবাদযোগ্য। তবে খরিফ-২ মৌসুমেই এটি বেশি চাষ করা হয়। জাতটির জীবনকাল ৬৫-৭০ দিন। জাতটি খাটো, খাড়া, বৃষ্টিসহিষ্ণু, রোগসহিষ্ণু এবং উচ্চ ফলনশীল (১,৬০০ কেজি/হেক্টর) হওয়ায় কৃষক পর্যায়ে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বারি মাস-৪ জাতটি ২০১৭ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। জাতটি পাউডারী মিলডিউ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জাতটির গড় ফলন ১.২৫-১.৪৪ টন/হেক্টর গাছে ফলের সংখ্যা ২৮-৩১টি, জীবনকাল ৬৯-৭৩ দিন।

খেসারি

খেসারী দেশে চাষযোগ্য ডাল ফসলের জমির মধ্যে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। বিনা যত্নে এবং সবচেয়ে কম উৎপাদন খরচে অধিক ফলনশীল এবং রোগ ও পোকা মাকড়ের প্রকোপ কম হওয়ায় কৃষক পর্যায়ে খেসারি ডাল খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া গো-খাদ্য হিসাবে খেসারীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনুর্বর জমিতেও খেসারী ভাল ফলন দেয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত খেসারির ৬টি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বারি খেসারি-২ এবং বারি খেসারি-৩ জাত দুইটি কৃষক পর্যায়ে অধিক ফলনের জন্য (১,৮০০-২,০০০ কেজি/হেক্টর) ব্যাপক জনপ্রিয়। যাদের জীবনকাল ১১৫-১১৮ দিন। ল্যাথাইরিজম রোগ সৃষ্টিকারী নিউরোটক্সিনের পরিমাণ কম (<০.০৪%) হওয়ায় ভোক্তা পর্যায়ে এই খেসারী জাতগুলি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বারি খেসারি-৪ নামে একটি নতুন জাত অবমুক্ত করা হয়েছে যা গো-খাদ্য হিসাবে বারি খেসারি-৫ জাতটি ভাউনি মিলডিউ এবং গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধী। গড় ফলন ১,৫০০-১,৭০০ কেজি/হেক্টর, রীলে ফসল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ODAP এর পরিমাণ খুব কম (০.০৪%) এর ফুল বড় গাঢ় নীল এবং বীজ মসৃণ ধুসর বর্ণের। গাছে ফলের সংখ্যা ৩০-৪৯টি। ১০০ বীজের ওজন ৫.৩-৫.৮ গ্রাম। ২০২০ সালে বারি খেসারি-৬ অবমুক্ত করা হয়, যা রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে বিশেষ উপযোগী। অধিক বায়োমাসসমৃদ্ধ, বীজের ODAP এর পরিমাণ খুব কম।

বারি খেসারি-৫

বারি খেসারি-৬

মটর

মটর একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর আমিষ সমৃদ্ধ সুস্বাদু খাদ্য যা মটর শুটি হিসাবেও বিভিন্ন সবজ, খিচুরী ও পোলাও জাতীয় খাবারকে সুস্বাদু করে তোলে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি মটর-১, বারি মটর-২, বারি মটর-৩ এবং বারি মটর-৪ নামক ৪টি জাত অবমুক্ত করেছে। বারি মটর-৩ জাতটি গোড়া পচা পাউডারী মিলডিউ এবং রাস্ট রোগ প্রতিরোধী। জাতটির ফসল শুঁটি হিসাবে ৫.৬-৬.০ টন/হেক্টর এবং বীজ হিসাবে ২.০-২.৩ টন/হেক্টর। বারি মটর-৪ জাতটির কচি পাতা ও ফল সবজি হিসেবে ব্যবহার যোগ্য। প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ২.২৮ টন।

বারি মটর-৩

বারি মটর-৪

ফেলন

লবণাক্ত অঞ্চলে চাষাবাদ উপযোগী অন্যতম ডাল ফসল ফেলন। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ভোলা, ফেনী অঞ্চলের মানুষের নিকট ফেলন ডাল অত্যন্ত সুপরিচিত। উপকূলীয় অঞ্চলের শস্য বিন্যাসে ফেলন অপরিহার্য ফসল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এর সবুজ ফল তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত ফেলনের দুইটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বারি ফেলন-২ অনুমোদিত হয় ১৯৯৬ সালে। জাতটির জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১৫০০ কেজি। জাতটি কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে এর বিস্তার ঘটেছে।

অড়হর

পরিপক্কতার ধরন ও সময়, অভিযোন ক্ষমতা, বীজের আকৃতি, রোগ ও পোকামাকড়ের প্রতি সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে বারি অড়হর-১ জাতটি ২০২৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। জাতটি সাদেশে চাষ উপযোগী।

বারি অড়হর-১

সবজি ফসল গবেষণা

বাংলাদেশে ৯০ টির অধিক বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ হয়ে থাকে। সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সবজি খাওয়া অপরিহার্য। কারণ জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক ভিটামিন ও খনিজের অন্যতম উৎস হল সবজি। এছাড়াও সবজিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শর্করা ও পানি বিদ্যমান। পুষ্টিবিদগণ দৈনিক মাথাপিছু ২২০ গ্রাম সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশে বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু সবজি গ্রহণের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে প্রায় চার ভাগের ১ ভাগ। সবজি ফসলের উন্নত জাতের অভাব ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার না করার ফলে বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি সবজির ফলন উন্নয়নশীল দেশসমূহের চেয়ে অনেক কম। বাংলাদেশে উৎপাদিত সবজির মধ্যে বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, বরবটি, মুলা, লাউ, পটল, কচু, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, শসা, ঢেঁড়স, লালশাক, ডাঁটা, পুঁইশাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর সবজির সেই চাহিদা পূরণে সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত জাতের অভাব, রোগ ও পোকার আক্রমণ, প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা ইত্যাদি সবজি চাষের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব উন্নত সবজির জাত ও প্রযুক্তি এ লক্ষ অর্জনে বিরাট সহায়ক ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৪

বারি এযাবৎ ৩৪টি টমেটো জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে ১১টি হাইব্রিড জাত রয়েছে। বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে বারি টমেটো ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ এবং বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, ৮, ৯, ১০ ও ১১ অন্যতম। বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, ৮ ও ১০ গ্রীষ্মকালীন জাত হিসেবে সারা দেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ জাতটি উচ্চতাপ মাত্রা সহনশীল হওয়ায় গ্রীষ্মকালে অধিক লাভজনক প্রযুক্তি হিসেবে সমাদৃত। উচ্চতাপমাত্রা সহনশীল এ জাত দুটি পলিটানেলে চাষ করে কৃষকরা উচ্চমূল্যে টমেটো বিক্রি করে লাভবান

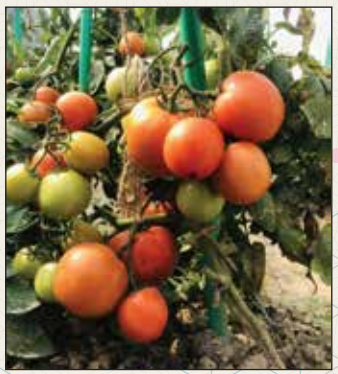

বারি টমেটো-২৩

হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে ফলন প্রায় ৪০-৪৫ টন/হেক্টর। সম্প্রতি উদ্ভাবিত বারি হাইব্রিড টমেটো-৯ উচ্চ ফলনশীল এবং ১০০-১২০ দিনে গড়ে ৯০-১০০ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম। উচ্চ ফলনশীল এসব জাতের মধ্যে বারি টমেটো-১৫ হলুদ পাতা কোকড়ানো ভাইরাস প্রতিরোধী এবং বারি টমেটো-১৬ ও ১৭ উচ্চ সংরক্ষনশীল জাত হিসেবে পরিচিত। বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ জাতটি গ্রীষ্মকালীন। হরমোন ছাড়াই গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতুতে ফল উৎপাদন করে। ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধী।

বারি কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৮টি বেগুনের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে ৬টি হাইব্রিড জাত রয়েছে। এদের মধ্যে বারি বেগুন ৮ ও বারি বেগুন ১০ উচ্চ ফলনশীল জাত ও ব্যাক্যটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। এ জাত দুইটি তাপ সহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন জাত হওয়ায় কৃষকদের কাছে সমাদৃত। সারা দেশে চাষ উপযোগী বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে ও খরা পীড়িত অঞ্চলে। এ জাত গুলির প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম এবং ফলন ৪০-৫৫ টন/হেক্টর। বারি হাইব্রিড বেগুন-৩ ও বারি হাইব্রিড বেগুন-৪ সারা দেশে শীতকালে চাষ উপযোগী। গাছ প্রতি ৩৩-৩৫ টি ফল ধরে, ফলের গড় ওজন ১০০-১২০ গ্রাম এবং ফলন ৫০-৫৫ টন/হেক্টর। বারি হাইব্রিড বেগুন-৫ ও ৬ বছর ব্যাপী আবাদ হয়। উচ্চ ফলনশীল।

বারি বেগুন-১২

বারি সাফল্যজনকভাবে বেগুনের ৪টি ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করেছে যা বিটি বেগুন নামে পরিচিত। Cry 1AC জীন প্রতিস্থাপন করে বারি বিটি বেগুন ১,২,৩ ও

বারি হাইব্রিড বেগুন-৬

বারি বিটি বেগুন-৪

৪ উদ্ভাবন করা হয়েছে যা বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী। বেগুনের এ জাতে প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হয়না বলে ক্ষতিকারক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় না। এতে উৎপাদন খরচ কম লাগে এবং অন্য জাতের তুলনায় অধিক ফলন পাওয়া যায়।

আগাম জাত হিসেবে বারি ব্রোকলি-১ উদ্ভাবন করা হয়েছে যা রোপণের ৭৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ উপযোগী। আকর্ষণীয় সবুজ রং এর হেড উৎপাদন করে। মুক্ত পরাগায়িত হওয়ায় সহজেই প্রচুর বীজ উৎপাদন করে। সাধারণত রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয় বলে হেক্টর প্রতি ১২ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

বারি লাউ-৪ সারা বছর ব্যাপী চাষ করা যায়। অধিক লাভজনক হিসাবে কৃষকদের নিকট ব্যাপক সমাদৃত বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে। গাঢ় সবুজ রং এর ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। গড় ফলের ওজন ২.৫ কেজি। সারা বৎসর ব্যাপী চাষ করা যায়। হেক্টর প্রতি ফলন রবি ৬০ টন ও খরিফ ৪০-৫০ টন।

বারি লাউ-৫ জাতটি আগাম জাতের। লাউ বোতল আকৃতির (গলা চিকন)। গাছপ্রতি ফলন ১৪-১৬টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন। খেতে সুস্বাদু। জাতটি আবাদ করে কৃষক লাভবান হতে পারেন।

বারি মিষ্টি মরিচ-১ মিষ্টি মরিচ বা ক্যাপসিকাম একটি উচ্চ মূল্যের সবজি। এটি সম্প্রতি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উজ্জ্বল সবুজ বেল আকৃতির ফল পাকলে লাল রং ধারণ করে। প্রতি গাছে ৭-৯ টি ফল ধরে এবং গড় ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। বারি মিষ্টি মরিচ-২ জাতটি ২০১৫ সালে অবমুক্ত হয়। জাতটি চকচকে সবুজ, ফল পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

বারি লালশাক-১

বারি শিম-১

বারি হাইব্রিড ধুন্দুল-২

বারি মুলা-১

বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-৩

বারি লাউ-৪

বারি গীমাকলমি-১

বারি ঝিঙ্গা-২ সারা দেশে গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী একটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল জাত। ফল আকর্ষণীয় সবুজ রঙের হয় এবং গাছ প্রতি ৪২-৪৮ টি ফল ধরে যার গড় ওজন ২০০ গ্রাম। এ জাতটির ফলন ২২-২৪ টন/হেক্টর।

বারি চীনাল-১ জাতটির ফলের শাস হালকা কমলা রং এর, ফল গোলাকার যা পাকার পর আকর্ষণীয় সোনালী হলুদ রং এর এবং সুগন্ধ যুক্ত। ফলের টিএসএস প্রায় ৬.৭ এবং আঁশ বিহীন। ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় এবং সংরক্ষণ কাল প্রায় ৫০-৬০ দিন। সারা দেশে বিশেষ করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য এলাকা ও সিলেটের জন্য উপযোগী।

বারি করলা-২

বারি ঢেঁড়শ-১

বারি পটল-২

বারি ঝাড়শিম-১

বারি হাইব্রিড শসা-১

বারি মিষ্টিমরিচ-১

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ

হাইড্রোপনিক কালচার

হাইড্রোপনিক পদ্ধতি হলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদনের একটি কৌশল। জনবহুল বহু দেশে যেখানে স্বাভাবিক চাষের জমি কম কিংবা নাই, সেখানে ঘরে ছাদে বা আঙ্গিনায়, পলি টানেল এবং নেট হাউজে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদন করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশ জনবহুল এবং অধিক সবজি উৎপাদনের জন্য জমি বাড়ানোর সুযোগ নেই, সেহেতু হাইড্রোপনিক পদ্ধতির মাধ্যমে টমেটো, ক্যাপসিকাম, লেটুস, শসা ইত্যাদি সহজে এবং সারা বৎসর ব্যাপী উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সাফল্যজনকভাবে টমেটো, ক্যাপসিকাম, লেটুস, শসা ও স্ট্রবেরি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সারা বছরই সবজি ও ফল উৎপাদন করা সম্ভব এবং উৎপাদিত সবজি ও ফলে কোনো কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না বিধায় এসব সবজি ও ফল নিরাপদ এবং এর বাজার মূল্যও বেশি।

ফল ফসল গবেষণা

বাংলাদেশে দানা শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও চাহিদার বিপরীতে ফলের উৎপাদন এখনও অনেক কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। ফল চাষ বাণিজ্যিক ভাবে অত্যন্ত লাভজনক, কারণ অন্যান্য ফসলের তুলনায় ফলের উৎপাদন ও বাজার মূল্য অনেক বেশি থাকায় এর চাষের মাধ্যমে কম জমি থেকে বেশি আয় করা সম্ভব। অপর দিকে অধিকাংশ ফল গাছ বহুবর্ষজীবী হওয়ায় একবার রোপণ করে দীর্ঘ দিন ফল আহরণ করা সম্ভব। ফলে একজন কৃষক ছোট খামার থেকে ফল চাষের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে আয় করতে পারে। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত ফলের ৬১% মধ্য-মে থেকে মধ্য-আগস্ট এই চার মাসে উৎপাদিত হয়, অপরদিকে অবশিষ্ট ৩৯% ফল বাকি ৮ মাসে উৎপাদিত হয়। ফলে দেশের মানুষ মে-থেকে মধ্য-আগস্ট পর্যন্ত সময়ে প্রচুর পরিমাণে ফল পেয়ে থাকলেও বছরের অবশিষ্ট সময়ে ফলের প্রাপ্যতা থাকে অনেক কম। ফলের চাহিদা মেটাতে এবং বছরব্যাপী যোগানের লক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউটের ফল

বিজ্ঞানীরা নিরলস গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি কাঁঠাল-১, বারি কাঁঠাল-২, বারি কাঁঠাল-৩, বারি কাঁঠাল-৪, বারি কাঁঠাল-৫ ও বারি কাঁঠাল-৬ নামে কাঁঠালের ছয়টি উন্নত জাত কৃষক পর্যায়ে চাষের জন্য মুক্তায়িত করেছে। উক্ত জাত চারটির মধ্যে বারি কাঁঠাল-২ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল অমৌসুমী জাত। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ প্রতি ৫৪-৭৯ টি ফল ধরে যার ওজন ৩৮০-৫৭৯ কেজি। ফল মাঝারী (৬.৯৫ কেজি), ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২১%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। হেক্টর প্রতি ফলন ৩৮-৫৮ টন। বারি কাঁঠাল-৩ জাতটি নিয়মিত ফল দানকারী উচ্চ ফলনশীল বার মাসী জাত। বারি কাঁঠাল-৪ জাতটি ক্যারোটিন সমৃদ্ধ হালকা হলুদ বর্ণের সুগন্ধযুক্ত মাধ্যম রসালো ফল। বারি কাঁঠাল-৫ এটি একটি অমৌসুমী ফল। জানুয়ারি-এপ্রিল মাস পর্যন্ত পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করা যায়। অপরদিকে বারি কাঁঠাল-৬ জাতটি নিয়মিত ফলদানকারী বারোমাসী জাত।

বারি কাঁঠাল-৫

বারি কাঁঠাল-৬

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আমের আঠারোটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত জাত সমুহের মধ্যে বারি আম-৩, বারি আম-৪, বারি আম-৮ ও বারি আম-১১ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বারি আম-৩ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং মধ্য আষাঢ়ে ফল আহরণের উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে, গড় ওজন ১৮০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন, রসালো, খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭১%। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়। হেক্টর প্রতি ফলন ২০ টন। বারি আম-৪ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। জাতটি স্থানীয় আশ্বিনা ও ফ্লোরিডার ৩৮২৬ জাতের মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতের আম গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে

এবং আষাঢ় মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও লাল আভাসহ সবুজ বর্ণের। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন, রসালো, খেতে খুব মিষ্টি (২৪% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০ টন। বারি আম-৮ প্রতি বছর ফলদানকারী রঙিন উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং মধ্য আষাঢ়ে ফল আহরণের উপযোগী হয়। বারি আম-১৭ জাতটি বিলম্ব মৌসুমী জাত শাঁস কমলা, সুগন্ধযুক্ত খাদ্যোপযোগী।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে কলার ৫টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বারি কলা-৩ (বাংলা কলার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত) ২০০৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য মুক্তায়িত করা হয়। প্রতি কাঁদিতে ১৪১ টি কলা হয় যার ওজন ২৩.৮ কেজি। ফল মধ্যম আকারের (১৪৪ গ্রাম)। হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন। পাকা ফল হলুদ রংয়ের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শাঁস আঠালো, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৫.৫%) ও সুস্বাদু। ফল পাকার পরও ৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। বারি কলা-৪ পার্বত্য এলাকা থেকে নির্বাচিত চাপা কলার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। প্রতি কাদিতে ফলের সংখ্যা ১৭৮টি যার ওজন প্রায় ১৯ কেজি। ফল মাঝারী আকারের গড় ওজন ৯৭ গ্রাম। ফল পাকা হলদে রংয়ের সম্পূর্ণ বীজ বিহীন এবং টক মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২০%) স্বাদের। হেক্টর প্রতি ফলন ৪০-৪৫ টন। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। বারি কলা-৫ জাতটি রান্না করে খাবার জন্য বিশেষ উপযোগী ও সুস্বাদু। প্রতিটি কাদিতে প্রায় ৯৫টি ফল ধরে। ফলের

বারি আম-৩

বারি আম-৪

বারি আম-১১

বারি আম-১২

বারি আম-১৩

বারি আম-১৮

খাদ্যোপযোগী অংশ ৬২% এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০ টন। বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি লিচু-৫

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফল বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিন নিরলস প্রচেষ্টায় ৫টি লিচুর জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বারি লিচু-৩ মাঝ-মৌসুমী ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উন্নত জাত। মধ্য মাঘে গাছে ফুল আসে এবং মধ্য জ্যৈষ্ঠে ফল আহরণের উপযোগী হয়। ফলের গড় ওজন ১৯ গ্রাম, ফল বেশি মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৫%। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ৫ টন। বারি লিচু-৪ মাঝ-মৌসুমী অতি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত। মধ্য মাঘে গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে ফল আহরণের উপযোগী হয়। পাকা ফলের রং উজ্জ্বল লাল। ফলের গড় ওজন ২৭ গ্রাম, ফল বেশী মাংসল, রসালো ও খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৮%। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন। বারি লিচু-৫ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত, যা পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বারি পেয়ারা-৪

বারি জামরুল-৩

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট "কাজী পেয়ারা", "বারি পেয়ারা-২" ও "বারি পেয়ারা-৩" এবং "বারি পেয়ারা-৪" নামে চারটি উন্নত জাত মুক্তায়িত করেছে। বারি পেয়ারা-২ উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খর্বাকৃতির, মধ্যম ছড়ানো, ও মধ্যম ঝোপালো। কমবেশি সারা বছর ফল দেয়। প্রধান মৌসুমে মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, গড় ওজন ৪০০ গ্রাম। পরিপক্ক ফলের রং হলুদাভ সবুজ। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১০%) ও কচকচে । বীজ অল্প ও নরম। গাছ প্রতি বছরে ৬৫ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি ফলন ৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

সম্প্রতি উদ্ভাবিত বারি পেয়ারা-৪ জাতটি বীজ বিহীন। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি ও কচকচে, কম-বেশি সারা বছর ফল পাওয়া যায়। ভরা মৌসুম হচ্ছে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর।

বারি রাম্বুতান-১ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও অত্যধিক ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল ধরে। শ্রাবণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল ডিম্বাকৃতির, আকারে বড় (৫০ গ্রাম)। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় লালচে খয়েরি। ফলের গায়ের কাটা বেশ লম্বা ও নরম। শাঁস পুরো, মাংসল, সাদা, নরম, রসালো সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)। বীজ ছোট ও নরম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন।

বারি লটকন-২

বারি অ্যাভোকেডো-১

বারি স্ট্রবেরি-৩

বারি পানিফল-১

বারি তরমুজ-২

বারি ড্রাগন ফল-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্ট্রবেরীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিবেচনায় বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি স্ট্রবেরি-১, বারি স্ট্রবেরি-২ ও বারি স্ট্রবেরি-৩ নামে ৩টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। বারি স্ট্রবেরি-২ বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি আমেরিকার ফ্লোরিডা হতে সংগ্রহ পূর্বক বাংলাদেশের আবহাওয়া অভিযোজন পরীক্ষাপূর্বক বাছাই পদ্ধতিতে মুক্তায়ন করা হয়েছে। গাছের গড় উচ্চতা ৩৫ সে.মি. এবং বিস্তার ৪৭-৫২ সে.মি.। ডিসেম্বরের প্রথমে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ প্রতি গড়ে ৩৭ টি ফল ধরে। গাছ প্রতি গড় ফলন ৭৪০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি ফলন ১৪-১৮ টন। হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল বেশ বড় আকারের, প্রান্ত ভাগ চ্যাপ্টা। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক মধ্যম নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১০%)। ভিটামিন সি-এর পরিমান ৭৬ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম। বারি স্ট্রবেরি-৩ জাতটি আমেরিকার ফ্লোরিডা হতে সংগ্রহ পূর্বক বাংলাদেশের আবহাওয়া অভিযোজন পরীক্ষাপূর্বক বাছাই পদ্ধতিতে মুক্তায়ন করা হয়েছে। গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সে.মি. এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সে.মি.। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে

গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ প্রতি গড়ে ৩৯ টি ফল ধরে। গাছ প্রতি গড় ফলন ৭৭০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০ টন। হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল বেশ বড় আকারের লম্বাটে, প্রান্তভাগ চোখা। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক তুলনামুলক শক্ত ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১০.৫ %)। ভিটামিন সি-এর পরিমান ৭২ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম। জাতদুটি ফল প্রদান মৌসুমে সিমিত সংখ্যক runner উৎপাদন করে বিধায় runner অপসারণজনিত শ্রমিক কম লাগে।

বারি মাল্টা-১

বারি কমলা-২

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ‘বারি ড্রাগনফল-১’ নিয়মিত ফলদানকারী ফলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি সুস্বাদু এবং এ থেকে প্রচুরসংখ্যক ফল আহরণ করা যায়।

ফুল গবেষণা

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ফুলের গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন ও বাণিজ্য অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছালেও আমাদের দেশে ফুল গবেষণা একটি নতুন অধ্যায় মাত্র। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের আওতায় ‘ল্যান্ডস্কেপ, অর্নামেন্টাল ও ফ্লোরিকালচার’ বিভাগ ফুলের জাত উদ্ভাবন, বংশবিস্তার পদ্ধতি, আধুনিক উৎপাদন কলা কৌশল, বীজ/কন্দ/ করম সংরক্ষণ ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ পর্যন্ত গ্লাডিওলাসের ৬টি, জারবেরার ২টি, চন্দ্রমল্লিকার ৪টি, ডালিয়ার ১টি, লিলির ১টি, এলপিনিয়া বা রেড জিঞ্জার এর ১টি, গাঁদার ১টি, রজনীগন্ধার ১টি, অর্কিডের ১টি, এ্যানথুরিয়ামের ১টি, লিলিয়ামের ৩টি, জিপসোফিলার ১টি, ক্যাকটাসের ১টি, সাকুলেন্টের ১টি এবং বাগান বিলাসের ১টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং ১৫টি আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও টিউলিপসহ বিভিন্ন ফুলের জাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে গবেষণা চলমান রয়েছে। এ বিভাগ

বারি গ্লাডিওলাস-৬

বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪

বারি সাকুলেন্ট-১

বারি বাগান বিলাস-১

বারি ক্যাকটাস-১

বারি এ্যানথুরিয়াম-১

বারি অর্কিড-১

বারি জারবেরা-২

বারি লিলি-১

বারি লিলিয়াম-৩

বারি জিপসোফিলা-১

টিউলিপ এর অগ্রবর্তী লাইন

বারি এলপিনিয়া-১

গবেষণার পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিসমূহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ, উন্নত ফুলের জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, লিফলেট-বুকলেট বিতরণ, মিডিয়ায় সম্প্রচার এবং চারা/কাটিং সরবরাহের মাধ্যমে ফুল চাষীদের উদ্বুদ্ধ তথা ফুল চাষে অনুপ্রাণিত করছে। ফলশ্রুতিতে দেশে ফুল চাষের জমি ও ফুল উৎপাদন আগের চেয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মসলা গবেষণা

মসলা ফসল পুষ্টিগুণের পাশাপাশি ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ বিধায় এর চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দৈনন্দিন জীবনে প্রধান ও অপ্রধান জাতীয় প্রতিটি মসলা কম/বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে এবং প্রায় প্রতিটি মসলা ফসলই Cash crop হিসাবে বিবেচনা যোগ্য। তাই মসলা ফসলের গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন সময়ের দাবি।

বারি পেঁয়াজ-৫

মসলা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে মসলা ফসলের উৎপাদন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪৩টি মসলা ব্যবহৃত হয়। প্রায় ৩৫টি মসলা এদেশে কমবেশি চাষ হয়ে থাকে। দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য মাথাপিছু মসলার চাহিদা ৫৪ গ্রাম, যেখানে মাত্র ৩৮ গ্রাম মসলা গ্রহণ করা হয়।

বারি পেঁয়াজ-৬

এ পর্যন্ত বিভিন্ন মসলা ফসলের পেঁয়াজের ৭টি, হলুদের ৫টি, মরিচের ৬টি, রসুনের ৫টি, আদার ৩টি, ধনিয়ার ৩টি, মেথির ৩টি, কালজিরার ১টি, গোলমরিচের ১টি, পানের ৩টি, পাতা পেঁয়াজের ১টি, আলুবোখরার ১টি, বিলাতি ধনিয়ার ১টি এবং মৌরির ২টি, দারুচিনির ১টি, তেজপাতার ১টি, একাঙ্গির ১টি, চিভ এর ১টি, ফিরিঙ্গির ১টি, পুদিনার ২টি, অর্নামেন্টাল মরিচের ২টি, রাধুনীর ১টি, শলুকের ১টি, জিরার ১টি, সুপারির ২টি, নেগি অনিয়নের ১টি, জোয়ানের ১টি এবং চুইঝালের ১টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। পেঁয়াজের ৭টি জাতের মধ্যে বারি পেঁয়াজ-১ উৎকৃষ্ট গুণাগুণসম্পন্ন, বারি পেঁয়াজ-৪ উচ্চফলনশীল ও ভাল সংরক্ষণ গুণসম্পন্ন শীতকালীন জাত। অপরদিকে বারি পেঁয়াজ-২, বারি পেঁয়াজ-৩, বারি পেঁয়াজ-৫, বারি পেঁয়াজ-৬ এবং বারি পেঁয়াজ-৭ উচ্চফলনশীল গ্রীষ্মকালীন জাত যা সারা বছর উৎপাদন করা যায়। বারি পিঁয়াজ-৫ আগাম ও নাবি খরিফ মৌসুমে উপযোগী স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল (১৬-২২ টন/হে.)। এটি সারা বছর চাষোপযোগী জাত। পাহাড়ী এলাকাসহ সুনিষ্কাশিত সব ধরনের জমিতে সারা বছরব্যাপী চাষাবাদ যোগ্য। হলুদের পাঁচটি জাতের মধ্যে সর্বশেষ ২০১২-১৩ সালে উদ্ভাবিত বারি হলুদ-৫ জাতটি উচ্চ ফলনশীল (১৮-২২ টন/হে), গাঢ় কমলা হলুদ বর্ণের বড় আকারের রাইজোম (৪০০-৫০০ গ্রাম/গাছ) বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ বেশি ২৬-৩০% থাকায় শুকনা

বারি ধনিয়া-৩

বারি দারুচিনি-১

বারি নেগি অনিয়ন-১

হিসাবে এটির ফলন অন্যান্য জাতের তুলনায় অধিক (৫.৪ - ৬.৫ টন/হে)। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী এ জাতটিতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম। অধিক ফলন ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল কমলা রঙের জাতটি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ২০১২-১৩ সালে অনুমোদিত 'বারি মরিচ-২' একটি উচ্চফলনশীল গ্রীষ্মকালীন মরিচের জাত। ফাল্গুন থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ছয় মাসের জীবনকালে এ জাতটির গাছপ্রতি ৭০০-৭৫০ গ্রাম (৪৫০-৫০০টি) মরিচ ধরে। কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ ও পাকলে উজ্জ্বল লাল রঙের প্রতিটি মরিচের দৈর্ঘ্য গড়ে ৭ সেন্টিমিটার ও ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম। এর ১০০০ বীজের ওজন ৪.৫ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি কাঁচা মরিচের ফলন ২৫-৩০ টন। এ জাতটিতে রোগ পোকার আক্রমণ কম এবং বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। 'বারি আলুবোখারা-১' এদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগী, অধিক ফলনশীল ও রোগবালাই মুক্ত জাত। আকর্ষণীয় লাল রঙের গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতির ফলগুলো প্রচুর ভিটামিন এবং ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। মাঝারি আকৃতির ফল (৮.৬ গ্রাম), টক মিষ্টি স্বাদের এবং ব্রিক্সমান ১০.৬%। এর বীজ খুব ছোট এবং ফলের প্রায় ৯৭.৪% ভক্ষণযোগ্য। প্রচুর ফল ধরে (২০০০-৩০০০টি/গাছ)। হেক্টরপ্রতি ফলন ৭-১০ টন/হেক্টর। এ জাতটি আবাদ করে প্রতি কেজি ৫০০/- টাকা হিসাবে ৩৫-৫০ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। বাংলাদেশের সর্বত্র সুনিষ্কাশিত জমি 'বারি আলুবোখারা-১' চাষের জন্য উপযোগী। অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত লাভজনক 'বারি বিলাতি ধনিয়া-১' এর উচ্চ পুষ্টিমান, প্রখর সুগন্ধিযুক্ত এবং উন্নত ভেষজ গুণের কারণে বিভিন্ন এলাকায় এর চাষাবাদ ও ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এ জাতটির পাতা আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের, দৈর্ঘ্যে ১৫-২০ সে. মি.ও প্রস্থে ২-৩ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি উচ্চফলনশীল (পাতা ৩০-৫০ টন/হেক্টর) (প্রতি কেজি ১০০/- হিসাবে ৩৫-৫০ লক্ষ টাকা) অধিক ফলন ও উচ্চমুল্যের মসলা। এদেশের আবহাওয়ায় সারা বছর আবাদ উপযোগী, পোকামাকড়ের আক্রমণ খুবই কম। খুব ভাল ঔষধি গুণাগুণ ও পুষ্টি মানের জন্য দেশে ও বিদেশে এর ভাল চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সারা বছর চাষের উপযোগী 'বারি পাতা পিঁয়াজ-১' জাতটি ২০১৩-১৪ সালে অনুমোদিত হয়েছে। উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন এ জাতটির পাতা অত্যন্ত নরম ও সুস্বাদু যা তরকারি, সুপ, ও মিশ্র সবজিতে ও চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত হয়। এর গাছের উচ্চতা প্রায় ৪৩-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি গাছে প্রায় ৬-৮টি গোছা থাকে। প্রতি গোছায় পাতার সংখ্যা ৬-১১টি । একবার বপনে বার বার এর পাতা সংগ্রহ করা যায়। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল ও উচ্চফলনশীল (পাত ১০-১৩ টন/হেক্টর) জাতটি বাংলাদেশের সকল সুনিষ্কাশিত জমিতে চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

বারি চুইঝাল-১

বারি আলুবোখারা-১

বারি পুদিনা-২

বারি আদা-৩

বারি তেজপাতা-১

বারি হলুদ-৫

বারি মরিচ-৪

বারি রসুন-৫

বারি সুপারি-২

বারি অর্নামেন্টাল মরিচ-২

বারি একাঙ্গী-১

বারি চিভ-১

বারি মৌরি-২

বারি পান-৩

বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতসমূহ

বারি মৌরি-২

কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা

কৃষিতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ১৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। বিএআরআই -এর সূচনা লগ্নে ১৯৭৯ সালে দেশে এ বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে ও উপ-কেন্দ্রেও এই বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে যাদের মাধ্যমে বিভাগটি সারা দেশে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভাগটির সূচনালগ্ন থেকে ধারাবাহিকভাবে কৃষি গবেষণায় অনন্য অবদান রেখে চলেছে। কৃষিতত্ত্ব বিভাগে মৌলিক, ফলিত এবং অভিযোজিত গবেষণা নিয়ে কাজ করা হয়। এ বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম শস্য ও আগাছা ব্যবস্থাপনা, বহুবিধ ফসল এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নামে তিনটি শাখায় পরিচালিত হচ্ছে। কৃষিতত্ত্ব বিভাগ বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ফসলের ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ফসলের উপযোগী জাত বাছাই, মাটির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, বিভিন্ন আগাছার জীবতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত আচরণ এবং আগাছা ব্যবস্থাপনা, শস্য উৎপাদন ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, আন্তঃফসল ব্যবস্থাপনা, ফসল ধারা উন্নয়ন এবং প্রতিকূল পরিবেশে ফসল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ও কৃষকের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিতত্ত্ব বিভাগ একটি নতুন ও অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসল চিয়া নিয়ে বিভিন্ন কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করছে।

আন্তঃফসল হিসাবে বেগুনের সাথে পাতা জাতীয় সবজি ও ঝাড়শীমের চাষ

আন্তঃফসল বাংলাদেশের একটি প্রাচীন পদ্ধতি এবং এটি জমি, শ্রম, সময় এবং সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি ইউনিট এলাকার মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসলের সঠিক নির্বাচন এবং উপযুক্ত রোপণ পদ্ধতি অবলম্বন করে, আন্তঃ/আন্তঃনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনা যেতে পারে যার ফলে মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বেগুন (*Solanum melongena* L.) একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি ফসল যা সারা বছর সারা দেশে চাষ করা হয়। এটি দীর্ঘ মেয়াদী সবজি (১৪০-১৮০দিন) এবং অধিক বপন দূরত্বসম্পন্ন (৮০ সেমি × ৬০ সেমি) ফসল। বেগুনের সাথে বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী সবজি (লাল শাক, পালং শাক এবং ঝাড়শীম) আন্তঃফসল করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

বেগুনের সাথে লালশাক

বেগুনের সাথে পালংশাক

বেগুনের সাথে ঝাড়শিম

আন্তঃফসল হিসাবে সরগমের সাথে মটরশুটির চাষ

বাংলাদেশ এবং ভারতে সরগমের পরিচিত নাম 'জোয়ার'। সরগম মানুষের এবং পশুপাখির খাদ্য হিসেবে পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। বাংলাদেশেও বিক্ষিপ্তভাবে এর চাষ হয়ে থাকে। ফসলটি খরাসহিষ্ণু হওয়ায় বাংলাদেশে সাধারণত চরাঞ্চলে অথবা কম উর্বর জমিতে সরগমের চাষ করা যায়। এটি প্রায় বৃষ্টিহীন এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মে। অপরদিকে মটরশুটি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি। এটি বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বাড়াতেও ব্যবহার করা হয়। এই সবজিতে বেশ ভালো পরিমাণে তন্তু থাকায় পেট পরিষ্কার রাখে ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।মটরশুটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। মটরশুটি চাষ করলে জোয়ারের ফলনে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। উপরন্তু বাড়তি ৫০-৭৫% মটরশুটি পাওয়া যায়। মটরশুটি একটি শিম জাতীয় ফসল হওয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মূল নডিউলে জমা হয় যা পরবর্তীতে মাটিতে যোগ হয়। ফলে মাটির উর্বরতা বজায় থাকে। আন্তঃফসল হিসেবে সরগমের সাথে মটরশুটি চাষ করলে কৃষক একই জমি থেকে একই সাথে একাধিক ফসল ও অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। এছাড়াও প্রতিকূল আবহাওয়ায় একটা ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হলেও কৃষক কমপক্ষে একটি ফসল সংগ্রহ করতে পারবে।

আন্তঃফসল হিসাবে সরগমের সাথে মটরশুটির চাষ

চলনবিল এলাকায় প্রচলিত পতিত-বোরো ফসল ধারা এর পরিবর্তে সরিষা- বোরো ফসল ধারার উন্নয়ন

বিল এলাকার জমি নিচু হওয়ায় জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪-৫ মাস পানির নিচে থাকে। বাংলাদেশের ২.৪৩ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা জুড়ে রয়েছে এই বিল এলাকা। এই অঞ্চলে কৃষি জমির ব্যবহার কম উৎপাদনশীল হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময় পতিত থাকে। চলনবিল এলাকায় বিদ্যমান প্রধান ফসলের ধারা হল পতিত-বোরো-পতিত। রবি ও খরিফ মৌসুমে জমি পতিত থাকে। মাটি থেকে পানি নেমে যাওয়ার পর সরিষা (বারি

সরিষার মাঠ

বোরো ধান মাঠ

সরিষা-১৪) চাষের মাধ্যমে পতিত জমি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এতে বোরো চাষে কোনো সমস্যা হয় না। ফসলের উৎপাদনশীলতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। কৃষকের আয়ও বাড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে যে সরিষা (বারি সরিষা-১৪) -বোরো ফসল ধারা চলনবিল এলাকার জন্য একটি উন্নত ফসল ধারা।

লবণাক্ত এলাকায় বিনা চাষে রসুন উৎপাদন

বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০% উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে যার ৫৩% হলো লবনাক্ত এলাকা। এসব এলাকায় কৃষি জমির ব্যবহার খুবই কম এবং সাধারণত এক ফসলি এলাকা, শুধুমাত্র স্থানীয় আমন ধান চাষ করা হয়। আমন ধানের পর জমি পতিত থাকে। এই লবণাক্ত এলাকায় রোপা আমন ধানের পরে বিনাচাষে রসুন আবাদের মাধ্যমে পতিত জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব। এতে শস্য নিবিড়তা, মোট উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। বারি রসুন-৪ উপকূলীয়অঞ্চলের জন্য উপযোগী। আমন ধান কাটার পর কর্দমাক্ত মাটিতে রসুনের কোয়া রোপণ করা হয়। কোয়ার এক তৃতীয়াংশ ২০ সেমি দ্ধ ১০ সেমি ব্যবধান বজায় রেখে কর্দমাক্ত মাটিতে পুতে দিতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় বিনা চাষে রসুন উৎপাদন

চিয়া ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা

চিয়া (Salvia hispanica L.) একটি উচ্চ মূল্যের ভেষজগুন ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফসল। চিয়ার আদি বাসস্থান মেক্সিকো ও গুয়াতিমালা। প্রচলিত বিভিন্ন দানাজাতীয় ফসল যেমন ধান, গম, ভুট্টা, ওট ও বার্লির তুলনায় চিয়া বীজে প্রোটিন, লিপিড ও শর্করার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি বলে সাম্প্রতিক সময়ে চিয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ইহা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক গুটিন মুক্ত এবং উচ্চ মাত্রার ভিটামিন, মিনারেল ও এন্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি ফসল। চিয়া বীজে প্রেটিন ১৫-২৫%, লিপিড ৩০-৩৩%, ফাইবার ১৮-৩০% এবং শর্করা ২৬-৪১% থাকে। চিয়াতে ওমেগা-৩ ফেটি এসিড থাকে যা শরীরের ক্ষতিকারক কোলেস্টরলের পরিমাণ কমিয়ে বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগের ঝুকি কমাতে সাহায্য করে।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, গুয়াতিমালা, পেরু ও আর্জেন্টিনায় চিয়ার চাষাবাদ হচ্ছে। ইহা সাধারনত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ভালো জন্মে এবং একটি স্বল্প মেয়াদি ফসল (১০০-১১০ দিন)। চিয়া একটি পানি সাশ্রয়ী ফসল ফলে ক্ষরাপ্রবন ও

শুষ্ক অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। পরিবেশগত কারণে চিয়া বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী ফলে কৃষকদের কাছে একটি নতুন সম্ভাবনাময় ও অর্থকরী ফসল হিসেবে ভূমিকা রাখবে। চিয়ার উচ্চ পুষ্টিমান ও ভেষজ গুনাগুনের কারণে বর্তমানে পৃথিবীর ৩০টিরও অধিক দেশে এর চাষাবাদ ও ব্যবহার হয়ে আসছে। চিয়ার চাহিদা বিশ্বে ২০২০ সালে প্রায় ২০০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজার প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

চিয়া ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা

চিয়ার গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ চিয়ার বিভিন্ন কৃষিতাত্ত্বিক ব্যাবস্থাপনা উপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে চিয়া চাষ করা যায়। চিয়ায় তুলনামূলকভাবে কম পানি ও সার লাগে। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫ টন হতে পারে। উচ্চ পুষ্টিমান, ভেষজ গুণাবলী ও ব্যাপক চাহিদার কারণে চিয়াকে সুপার ফুড হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্ভিদ প্রজনন গবেষণা

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ভুট্টা, বার্লি, মিলেটস্ ও সরগম এর মত উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নই হচ্ছে এই বিভাগের প্রধান কাজ। এই বিভাগ হতে এ পর্যন্ত ১৬টি হাইব্রিড ভুট্টা এবং ৯টি মুক্ত পরাগায়িত ভুট্টার জাত অবমুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে একটি খৈ ভুট্টা, একটি মিষ্টি ভুট্টা ও একটি বেবী ভুট্টার জাতও রয়েছে। এ ছাড়াও বার্লির ১০টি, কাউনের ৪টি, চিনার ২টি, তুষার ১টি, জোয়ার-এর ১টি, রাঘীর ১টি, ওটের ১টি, চিয়ার ১টি, ঢেমশীর ১টি এবং কিনোয়ার ১টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

বারি বার্লি-১০

কৃষক পর্যায়ে জাতগুলোর যথাযথ- ব্যবহারের জন্য এই বিভাগ কৃষিতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বীজ প্রযুক্তি, খামার যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ও সরেজমিন গবেষণা বিভাগের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও এ সকল ফসলের বীজ উৎপাদনের জন্য বিএডিসি এবং অন্যান্য ব্যক্তি মালিকানাধীন বীজ কোম্পানিকে সহযোগিতা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলার জন্য আর্ন্তজাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) এর সহযোগিতায় অধিক তাপ সহিষ্ণু ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ভুট্টার জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। অধিকন্তু উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন অধিক ফলনশীল বেশ কিছু খৈ ভুট্টা ও বেবি কর্ণের হাইব্রিড জাত হিসাবে অবমুক্তির অপেক্ষায় আছে। উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে

ভুট্টা গবেষণার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল ঢলে পড়া প্রতিরোধ (lodging resistant) ক্ষমতাসম্পন্ন খাট জাত উদ্ভাবন করা। এ লক্ষ্যে অত্র বিভাগের গবেষণা অর্জন ঈর্ষণীয়। ভুট্টার বেশ কিছু উচ্চ ফলনশীল খাটো আকারের ঢলে পড়া প্রতিরোধী হাইব্রিড পাওয়া গেছে যা অচিরেই হাইব্রিড জাত হিসাবে অবমুক্ত করা হবে। অত্র বিভাগ থেকে বার্লির ১০টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে বারি বার্লি-৭, ৮, ৯ ও ১০ খুবই সম্ভাবনাময়।

বারি কাউন-৪

বারি চিয়া-১

বারি কিনোয়া-১

বারি চেমশি-১

বারি জোয়ার-১

বারি ওট-১

বারি চিনা-২

পোকামাকড় ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ফসলের পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। বালাইনাশকের উপর একক নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, উৎপাদক ও ভোক্তার জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যা আইপিএম নামে পরিচিত। আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, বারির বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ফসলের সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছে যা কৃষক পর্যায়ে ব্যপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদের কার্যকারিতার জন্য কৃষকদের নিকট এটি 'যাদুর ফাঁদ' হিসেবে পরিচিত। বেগুন ফসলে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষকদের নিজস্ব পদ্ধতি, কীটনাশকের ব্যবহারের চেয়ে ১.৫ গুণ কম খরচে ঋতুভেদে প্রায় ১.৫ হতে ২.০ গুণ অধিক বেগুন ফলানো এবং ২ হতে ৫ গুণেরও অধিক অর্থ আয় করা সম্ভব। অন্যদিকে আইপিএম পদ্ধতি অর্থাৎ সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ যৌথভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে মাছি

আম গাছে ফেরোমন ফাঁদ

করলার জমিতে ফেরোমন ফাঁদ

পোকা দমন করা সম্ভব এবং সাথে সাথে আর্থিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। দেখা গেছে যে, করলার জমিতে আইপিএম পদ্ধতিতে কৃষকদের নিজস্ব পদ্ধতি অর্থাৎ কীটনাশক ব্যবহারের চেয়ে হেক্টরপ্রতি চার গুণ কম খরচ করে প্রায় দ্বিগুণ অর্থ আয় করা সম্ভব। একইভাবে বারি উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ করে অন্যান্য সবজি যেমন, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কচু, ঢেঁড়শ, শিম ইত্যাদি এবং আম, পেয়ারা, কমলা, ডালিম ইত্যাদি ফলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তেমনি প্রযুক্তিসমূহ স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন হওয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। কোন ধরনের কীটনাশক (বিষ) প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না বলে উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতিসূমহ পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যগত সমস্যামুক্ত।

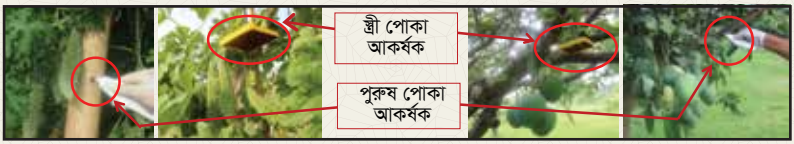

উন্নত আইপিএম প্রযুক্তি

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

১৯৯০ সালে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন তৎকালীন কৃষি প্রকৌশল বিভাগ বিভক্ত হয়ে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং এফএমপিই এই দুইটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর আগে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কৃষি প্রকৌশল বিভাগের একটি শাখা ছিল। জন্মলগ্ন হতেই অত্র বিভাগ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ফসলের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে সেচের সঠিক সময় ও সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ সহ সেচের তালিকায়ন ফসল ভেদে সেচের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, ভূগর্ভস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহারসহ সেচের পানির প্রয়োগের সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন সহ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নানামুখী গবেষণা করে আসছে। বিগত প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ত মাটি ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের কিছু সংখ্যক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে ছড়া/নালায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে উক্ত পানি দিয়ে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত অত্র বিভাগ হতে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রায় ৪৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যাদের অধিকাংশই কৃষক পর্যায়ে প্রয়োগ করে কৃষক লাভবান

হচ্ছেন। অত্র বিভাগের বিজ্ঞানীগণ বিগত প্রায় ৮/১০ বৎসর যাবৎ উচ্চমূল্যের ফসলে মাইক্রো সেচ পদ্ধতি যেমন : ড্রিপ, ফার্টিগেশন, স্প্রীংলার এর গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে গবেষকগণ টমেটো (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন), বেগুন, ক্যাপসিকাম, স্ট্রবেরি, তরমুজ, পেঁপে, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ফসলের জন্য ফার্টিগেশন ও স্প্রীংলার সেচ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যেগুলো মধ্যম মানের কৃষকসহ বাণিজ্যিক কৃষকগণ উল্লিখিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। বর্তমানে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে স্বাদু পানি/লবণাক্ত পানি মিশ্রণে বিভিন্ন ফসলে উৎপাদনে সেচ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ সৌরচালিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের সম্ভাব্যতা, গ্রীষ্মকালীন মরিচ উৎপাদনে জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

পানির বিভাজন যন্ত্রের ব্যবহার

নলকূপে পানি বিভাজন যন্ত্রের ব্যবহার

পানির বিভাজন যন্ত্রটি হলো এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে একই সময়ে ব্যবহার করে ২ থেকে ৪ জন কৃষক ভিন্ন ভিন্ন ফসল বা একই ফসলের বিভিন্ন জমিতে সেচ দিতে পারে। সাধারণত দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটিতে মসলা জাতীয় ফসল, সবজি ফসলে সেচ দেওয়ার সময় অত্যধিক পানি প্রবাহের কারণে গাছের গোড়ায় মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, গাছের মূলের ক্ষতি হয় এবং পানির অপচয় হয়। এতে শস্যের ফলন অনেক কমে যায়। তাই পানির বিভাজন যন্ত্রের সাহায্যে যদি পানির প্রবাহকে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য ব্যবহার করা হয়, এতে পানি প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পেঁয়াজ ও রসুনসহ অন্যান্য মসলা জাতীয় ফসল এবং ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি ফসলের জন্য যন্ত্রটি অধিকতর উপযোগী। পিভিসি উপকরণ দিয়ে এ যন্ত্রটি স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায়।

লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ এলাকায় ড্রিপ/ফার্টিগেশন সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন

ড্রিপ/ফার্টিগেশন বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সেচ প্রযুক্তি যার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড্রিপ সেচ ট্রিফল বা মাইক্রো সেচ নামেও পরিচিত। ড্রিপ/ফার্টিগেশন এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা পানির ভাল্‌ভ, পাইপ এবং এমিটার্স নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাটির পৃষ্ঠ বা সরাসরি গাছের শিকড় অঞ্চলে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি দেয়া হয়। পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে সময়মত ফসলে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত: প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে এক কেজি সার মিশাতে হয়। ড্রিপ/ফার্টিগেশন সেচ এবং মাল্চ প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফসল/ফল যেমন ঃ টমেটো, বেগুন, তরমুজ, ক্যাপসিকাম, পেঁপে, গোয়াবা, স্ট্রবেরি ইত্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পানি ২/৩ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়। এই পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পটাশ, ৪০-৪৫ ভাগ ইউরিয়া এবং

৫০-৫৫ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ফলন বেশি পাওয়া যায় ও অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব। ড্রিপ সেচের ফলে গাছের মূলাঞ্চলের মাটির লবণাক্ততা কমে যায় যা ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খরাপীড়িত ও সেচ সংকট এলাকা, লবণাক্ত এবং পাহাড়ী অঞ্চলে সেচের পানির অভাব থাকায় সেখানে ড্রিপ/ফার্টিগেশন এবং মাল্চ খুব উপযোগী প্রযুক্তি। বর্তমানে এ পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায়।

ড্রিপ/ ফার্টিগেশন সেচ পদ্ধতিতে (ক) টমেটো, (খ) স্ট্রবেরি, (গ) বেগুন (ঘ) ক্যাপসিকাম উৎপাদন

শস্য বিন্যাস ভিত্তিক সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় লবণাক্ত ও খরা প্রবণ এলাকার জন্য টেকসই ফসল উৎপাদনে শস্য বিন্যাস ভিত্তিক পরিমিত সেচ ও যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনার ফলে জমি ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিএআরআই এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, International Centre for Biosaline Agriculture (ICBA), দুবাই এর সঙ্গে পারস্পারিক সহযোগিতায় গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে উঁচুবেডে মালচ্ এবং ড্রিপ সেচের মাধ্যমে মাটির লবণাক্ততা উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে (১০-১২ ডিএস/মি হতে ৪.৫-৫.৫ ডিএস/মি) হ্রাস পায় এবং ফলনও প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বিএআরআই এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে পরিবর্তিত জলবায়ু মোকাবেলায় খরাপ্রবণ ও লবণাক্ত অঞ্চলে টেকসই শস্য বিন্যাস ভিত্তিক উন্নত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত

হচ্ছে। শস্যবিন্যাস ভিত্তিক সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তির ব্যবহারে লবণাক্ত ও খরাপীড়িত এলাকার কৃষকগণ লাভবান হচ্ছে। সাথে সাথে সেচের পানির সাশ্রয়ী ফসলধারা চাষ করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাস পাবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

শস্য বিন্যাস ভিত্তিক সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

ফসল উৎপাদনে শহর/পৌর বর্জ্য পানির ব্যবহার

শহর/পৌর বর্জ্য পানিতে ক্ষতিকর উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম থাকে বিধায় ফসল উৎপাদনে শহর/পৌর বর্জ্য পানি ব্যবহারের ঝুঁকি নেই। তাই শহরের বর্জ্য পানি শুষ্ক মৌসুমে সফলভাবে সেচ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে যে, শহর/পৌর বর্জ্য পানি দ্বারা গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি ফসলে সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধির সাথে সাথে শতকরা প্রায় ২০-২৫% রাসায়নিক সার সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচও কমে যায়। তবে পৌর বর্জ্য পানিতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকার কারণে সালাদ জাতীয় ফসল চাষে সেচ দেওয়ার জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রাজশাহী শহরতলীসহ অন্যান্য খরাপ্রবণ শহরতলী এলাকায় এই প্রযুক্তির ব্যবহার অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা করবে।

ফসল উৎপাদনে শহর/পৌর বর্জ্য পানির ব্যবহার

অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন

অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো উৎপাদন

কৃষি কাজে ফসল উৎপাদনে পানির সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় পানির অপচয় বেড়ে যায় এবং সেচ এলাকাও কমে যায় এবং গাছের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ পানির অভাবে ফলন কমে যায়। ফলে অপচয় রোধ এবং সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতি নামে নতুন একটি সেচ পদ্ধতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশে প্রথম উদ্ভাবন করে। এটি এমন একটি সেচ পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি ফারো অন্তর অপর ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয়। দুই ফারোর মধ্যবর্তী ফারো শুষ্ক থাকে যা পরবর্তী সেচের সময় শুষ্ক ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয় এবং পূর্বের সেচকৃত ফারোগুলো পরবর্তী সেচের সময় শুষ্ক রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে ফসলের তেমন কোন ক্ষতি না করে শতকরা প্রায় ৩০-৩৫% পানি সাশ্রয় হয়। এই পদ্ধতি সারিতে লাগানো ফসল যেমন- টমেটো, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি উৎপাদনে ফারোর মাধ্যমে সেচের জন্য উপযুক্ত। খরাপ্রবণ ও লবণাক্ত এলাকায় ফসল উৎপাদনে যেখানে পানির ব্যবহার সীমিত, সেসব এলাকায় সেচের পানি বিতরণের ক্ষেত্রে এটি একটি সহজতর সময়োপযোগী কৃষক বান্ধব সেচ পদ্ধতি।

ঘাটতি সেচ এবং মাল্চ পদ্ধতিতে ফসল/বীজ উৎপাদন

যে সকল এলাকায় পানির ঘাটতি আছে, সেসব এলাকায় ঘাটতি সেচ এবং মাল্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য পরিমিত সেচ এবং মাটির রস বজায় রাখার জন্য মাল্চ অপরিহার্য। পানির ঘাটতিজনিত কারণে ফসলের সংকটকাল পর্যায়ে এই প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। মাল্চ ব্যবহার করার ফলে শতকরা ২০ ভাগ পানি কম প্রয়োগ করেও অধিকতর ফলন পাওয়া সম্ভব। গম, সূর্যমুখী, সরিষা ইত্যাদিতে ঘাটতি সেচ এবং পেঁয়াজের বীজ ও করলা ইত্যাদি উৎপাদনে ঘাটতি সেচ এবং মাল্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন অধিকতর বৃদ্ধি এবং গুণগত মান বজায় থাকে। খরা প্রবণ এলাকায় এই প্রযুক্তি আরও অধিকতর কার্যকরী।

ঘাটতি সেচ এবং মাল্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন

ফসলের বাষ্পীয় প্রস্বেদন সহগ (Kc)

বিভিন্ন ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ফসলের পানির চাহিদা মাটি, জলীয় বাষ্প, শস্যের প্রকার, তাপমাত্রা, অঞ্চল ইত্যাদিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন সেচে কতটুকু পানি প্রয়োগ করতে হবে, তা নির্ভর করে ঐ সেচ হতে পরবর্তী সেচ পর্যন্ত শস্যের মোট কতটুকু পানির প্রয়োজন হয় তা নিচের সারণী ব্যবহার করে শস্যের প্রয়োজন অনুযায়ী পানির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

সারণী : ফসলের বাষ্পীয় প্রস্বেদন সহগ (K_c) এর মান

ফসলের নাম		বাষ্পীয় প্রস্বেদন সহগ (K_c)			
ক্রমিক নং	নাম	প্রাথমিক পর্যায়	বর্ধন পর্যায়	মধ্যবর্তী পর্যায়	শেষ পর্যায়
১	গম	০.৪২	০.৭৮	১.১৩	০.৪৮
২	ভূট্টা	০.৩৮	০.৮৭	১.৩৬	০.১৮
৩	আলু	০.২৫	০.৬২	০.৭০	০.২৩
৪	টমেটো	০.৪৬	০.৮৩	১.০৮	০.৮৬
৫	সরিষা	০.৬৮	০.৯৮	০.০৭	১.২৬
৬	বেগুন	০.৪২	০.৮০	১.৩০	০.৯৩
৭	ফুলকপি	০.৪৮	০.৯৫	০.৯১	০.৭৫
৮	রসুন	০.৫১	০.৮৭	১.০৮	০.৬১
৯	পেঁয়াজ	০.৬৮	০.৯৩	১.২৩	০.৭৮
১০	মসুর	০.৩৫	১.০৯	০.৮২	০.৪৭

প্রসেসিং আলু উৎপাদনে সেচ প্রযুক্তি

আলু উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে গমের পরেই প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য হিসাবে আলুর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে রবি মৌসুমে আলুতে সেচ প্রয়োগ করলে ফলন কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আলুর তিনটি সংবেদনশীল বৃদ্ধি পর্যায়

(স্টোলন বের হওয়া পর্যায়, গুটি বের হওয়া পর্যায় এবং গুটি বৃদ্ধি পর্যায়) রয়েছে যে সময় সেচ একান্ত অপরিহার্য। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, গাছের চাহিদা মোতাবেক মাটিতে উপযুক্ত সময়ে সঠিক পরিমাণ পানি প্রয়োগ করলে প্রসেসিং আলুর ফলন ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং খরচও কমে যায়। রবি মৌসুমে আলু উৎপাদনের জন্য প্রায় ২০-২৫ সে. মি. পানির প্রয়োজন হয়। পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে প্রসেসিং আলুর গুণগত খাদ্যমান অর্থাৎ টিএসএস, ঘনত্ব, এবং শর্করা ইত্যাদি বজায় থাকে।

উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রসেসিং আলু উৎপাদন

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব গবেষণা

উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাই রোগবালাইকে ফসল উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফসলের রোগবালাই দমন করে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই কার্যক্রম শুরু করে। অত্র বিভাগ মূলত ফসলের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, কারণ নির্ণয়, নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, রোগ সৃষ্টিতে আবহাওয়ার ভূমিকা, মহামারী আকারে রোগবালাই দেখা দেওয়ার আবহাওয়া জনিত অবস্থা, রোগবালাই দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা করে থাকে যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। অত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদ্ভিদরোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে আসছে এবং প্রতিনিয়তই রোগবালাই ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য অত্র বিভাগের বিজ্ঞানীগণ নিরলস গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি রোগবালাই দমন প্রযুক্তি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

রোগের নাম: আদার কন্দ পচা বা রাইজম রট

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- আক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে হলুদ হয়ে যায়, পরবর্তীতে গাছ আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়।

- আক্রান্ত গাছ টান দিলে খুব সহজেই উঠে আসে এবং আক্রান্ত গাছের কন্দ/ রাইজম পচে যায় এবং ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

আদার কন্দ পচা বা রাইজম রট

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগমুক্ত জমি থেকে আদার বীজ সংগ্রহ করা। অর্ধপচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর মাটিতে বীজ বপনের ২১ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পচাতে হবে। অতঃপর মাটিতে স্টেবল ব্লিচিং পাউডার ২০ কেজি/হেক্টর হারে জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর রিডোমিল গোল্ড (০.২%) হারে বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ৪০ দিন পর থেকে প্রতি ১২-১৫ দিন অন্তর রিডোমিল গোল্ড (০.২%) ৩-৪ বার চারার গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

রোগের নাম: মসুরের গোড়া পচা রোগ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চারা অবস্থায় এ রোগ হলে গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে এবং মারা যায়।
- আক্রান্ত গাছের পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ রং ধারণ করে। গাছ নেতিয়ে পড়ে মারা যায়।
- আক্রান্ত স্থানে সাদা রঙের ছত্রাকের মাইসেলিয়া এবং সরিষার দানার মত স্কেলেরোসিয়াম গুটি দেখা যায়।

গোড়া পচা রোগাক্রান্ত মসুর ক্ষেত

দমন ব্যবস্থাপনা

আংশিক পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর হারে বীজ বপনের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে পচাঁতে হবে। অতঃপর প্রোভেক্স (০.২৫%) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে। চারা গাজানোর ২০-২৫ দিন পর একবার এবং ৩৫-৪০ দিন পর দ্বিতীয় বার প্রোভেক্স ০.২৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

রোগের নাম: ছোলার ঢলে পড়া বা উইল্ট

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে গাছ হঠাৎ করে ঢলে পড়ে কিন্তু গাছের পাতার রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। আক্রান্ত গাছের পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ রং ধারণ করে। গাছ নেতিয়ে পড়ে মারা যায়।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছ এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে গাছের পাতা হলুদ হয় এবং আস্তে আস্তে গাছ নেতিয়ে পড়ে এবং পরিশেষে গাছ মারা যায়।

ঢলেপড়া রোগাক্রান্ত ছোলা ক্ষেত

দমন ব্যবস্থাপনা

আংশিক পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর হারে বীজ বপনের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে পচাতে হবে। অতঃপর ব্যাভিস্টিন (০.২৫%) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর একবার এবং ৩৫-৪০ দিন পর দ্বিতীয় বার ব্যাভিস্টিন ০.২৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

রোগের নাম: কলার পানামা

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- নিচের পাতার কিনারা হলুদ হয় ও পত্রফলক পত্রবৃন্ত থেকে ভেঙ্গে ঝুলে পড়ে।
- কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটেও যেতে পারে এবং ভাসকুলার বান্ডেল হলদে বাদামী রং ধারণ করে। গাছ ফলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ও মারা যায়।

পানামা রোগাক্রান্ত গাছ

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগমুক্ত চারা ব্যবহার। কলার জমিতে পানি নিকাশের সুব্যবস্থা রাখা। চারা লাগানোর পূর্বে ছত্রাকনাশক ব্যাভিস্টিন ২.৫ গ্রাম/লিটার হারে চারা শোধন করা।

রোগের নাম: পটলের গিঁটকৃমি

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

ফসলের শিকড়ে গিট এর উপস্থিতিই এ রোগের লক্ষণ। ফলে শিকড় স্বাভাবিকভাবে মাটি থেকে পানি ও পুষ্টি সংগ্রহ এবং পরিবহন কতে পারে না। বিশেষ করে খরার সময় ঢলে পড়ে, অতি বর্ষায় শিকড়ে পচন হয়, গাছ মারা যায়।

কৃমি আক্রান্ত পটল গাছ ও শিকড়

দমন ব্যবস্থাপনা

নতুন পটলের লতা লাগানোর আগে বিঘাপ্রতি দেড় টন হারে মুরগির কাচা বিষ্ঠা প্রতি বিঘাতে বা প্রতি মাদায় গর্ত করে প্রতি গর্তে ৫-১০ কেজি হারে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত পচনের জন্য ফেলে রাখতে হবে। লাগানোর পূর্বে প্রতি গর্তে ১৫-২০ গ্রাম হারে ফুরাডান ৫ জি প্রয়োগ করে লতা লাগাতে হবে।

রোগের নাম: টমেটো ও কপি চারার ড্যাম্পিং অফ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

আক্রান্ত অংকুরিত চারার রং ফ্যাকাসে সবুজ হয় ও কাণ্ডের নিচের দিকে মাটি বরাবর বাদামী রঙের পানি ভেজা দাগ পড়ে। আক্রান্ত জায়গায় চারার গোড়া পচে যায় ও চারা মারা যায়।

ড্যাম্পিং অফ আক্রান্ত টমেটো ও কপি চারা

দমন ব্যবস্থাপনা

মুরগির আধা পচা বিষ্টা (ছয় মাসের পুরাতন) হেক্টর প্রতি ৩-৫ টন/সরিষার খৈল হেক্টরপ্রতি ৪০০ কেজি হারে বীজ বপনের তিন সপ্তাহ আগে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

রোগের নাম: টমেটো ও বেগুনের ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া/উইল্ট

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

আক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ অবস্থাতেই ঝিমুতে শুরু করে এবং গাছটি সবুজ

ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত টমেটো ও বেগুন গাছ

অবস্থাতেই মারা যায়। গাছ তুলে ছুরি দিয়ে গোড়া কেটে কাঁচের গ্লাসের পানিতে কাটা প্রান্ত ডুবালে দেখা যাবে দুধের মত সাদা সুতার মত ব্যাক্টেরিয়া অবিরত বের হচ্ছে।

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগ প্রতিরোধী জাত যথা বারি বেগুন-৮ এর চাষ করা। উক্ত বেগুন গাছকে রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করে বেগুন ও টমেটোর জোড় কলম করা।

রোগের নাম: টমেটো ও বেগুনের শিকড়ের গিট কৃমি/রুট নট নেমাটোড

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

গাছ তুললে শিকড়ে অসংখ্য ছোট বড় গিট দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত স্থলের কোষের আকার খুব বড় হয়। কোষের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। গাছে ফুল ধরার ক্ষমতা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং ফল ধরে না বললেই চলে।

কৃমি রোগে আক্রান্ত টমেটো ও বেগুন গাছের কড়

দমন ব্যবস্থাপনা

চারা লাগানোর আগে বিঘাপ্রতি ১.৫ টন হারে মুরগির কাচা বিষ্ঠা প্রতি বিঘাতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত পচনের জন্য ফেলে রাখতে হবে। লাগানোর পূর্বে মাটিতে ফুরাডান ৫ জি ২৫ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করে চারা লাগাতে হবে।

রোগের নাম: সরিষার সাদা মল্ট রোগ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- প্রথমে গাছের পাতা ও কাণ্ডের উপর তুলার মত সাদা সাদা ছত্রাকের মাইসেলিয়াম দেখা দেখা যায়।
- পরবর্তীতে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে, কাণ্ড পচে ভেঙ্গে পরে এবং ফলন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত/ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সরিষার সাদা মল্ট রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভ্রাল (০.২%) বা টিল্ট (০.০৫%) অথবা ফলিকুর (০.১%) ১২ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার গাছে স্প্রে করলে সাদা মল্ট রোগ সাফল্যের সাথে দমন করা যায়।

রোগের নাম: লেবুজাতীয় সংগ্রহোত্তর কেংকার রোগ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- প্রথমে ফলের গায়ে ছোট ছোট হলদে দাগ দেখা যায়।
- কয়েক দিনের মধ্যে দাগগুলো আকারে বড় হয় এবং দাগগুলো উঁচু উঁচু ফোস্কার মত মনে হয়। ফলে লেবুজাতীয় ফলের বাজার মূল্য কমে যায়।

লেবুজাতীয় সংগ্রহোত্তর কেংকার রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

সংগ্রহের পর লেবুজাতীয় ফল সোডিয়াম ওর্থোফিনাইল ফিনেট দ্রবণে ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে এ রোগ ভালভাবে দমন করা যায়।

রোগের নাম: পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- প্রথমে পাতার উপর হালকা হলুদ রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।
- কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকটি দাগ একত্রিত হয়ে বড়দাগে পরিণত হয়। দাগগুলো ধীরে ধীরে ধুসর বা কালচে রং ধারণ করে, পাতা ভেঙ্গে পড়ে।

পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ইভারল ৫০ ডব্লিউ পি (ইপ্রোডিয়ন) ২ মিলি/লিটার হারে ১০ দিন অন্তর অন্তর ৪ বার গাছে স্প্রে করলে এই রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ গবেষণা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফসল উন্নয়ন কর্মসূচীতে কাংক্ষিত জার্মপ্লাজম সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কেন্দ্রের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (ঈশ্বরদী, জামালপুর, যশোর, রংপুর, খাগড়াছড়ি) ও ৩ টি ক্লোনাল জিন ব্যাংক (সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী) রয়েছে। কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো (১) বংশানুক্রমিক কৃষি ব্যবস্থায় ব্যবহৃত দেশীয় বিভিন্ন ফসলের জাত এবং তাদের বন্য প্রজাতির গুলোর অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ ও সংগ্রহকরণ (২) জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা (৩) সংগৃহীত জার্মপ্লাজম সমূহের বীজ বর্ধন, বৈশিষ্ট্যায়ন ও মূল্যায়ন (৪) গবেষণা ও জাত উদ্ভাবনের জন্য কাংক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জার্মপ্লাজম ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিনিময়। বর্তমানে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের জিন ব্যাংকে মধ্য-মেয়াদী সংরক্ষরণে (৪-৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)

উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র

ও দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণে (-১৮ হতে -২২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) এবং ফিল্ড জিন ব্যাংকে (মাঠ পর্যায়ে) জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট ১৫৭ টি ফসলের মোট ১১৬৮৬ টি জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হয়েছে। রিক্যালসিট্রেন্ট (Recalcitrant) বীজ উৎপাদনকারী ফসল এবং অঙ্গজ বংসবিস্তার সম্পন্ন ফসল গুলোর জার্মপ্লাজম উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রর ফিল্ড জিন ব্যাংক ও ক্লোনাল জিন ব্যাংক (সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী) তে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংগৃহীত ফসল সমূহের মধ্যে জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৫৭১১ টি জার্মপ্লাজমের অংগসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যায়ন করা হয়েছে। সংগৃহীত প্রতিশ্রুতিশীল জার্মপ্লাজম সমূহ নিয়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীগণ জাত উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন এবং বেশ কিছু জাত ইতোমধ্যেই অবমুক্ত করা হয়েছে। ভৌগলিক নির্দেশক-ফসল (Geographical Indication Crops) এবং অবমুক্ত জাতের উপর আইনগত অধিকার বা মেধা সত্ত্বাধিকার (IPR) নিশ্চিতকরণ ও জার্মপ্লাজম সমূহের ডুপ্লিকেশন কমানোর লক্ষ্যে মলিকুলার বৈশিষ্ট্যায়ণের কাজও করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মুগডালের ৪২ টি, বেগুনের ৮৫ টি, খেসারীর ২৫ টি, ভুট্টার ২৪ টি, মুসুরের ৭ টি, মরিচের ১১৮ টি, সরিষার ২৫ টি, বাঙ্গির ৯৬ টি ও আমের ১৯ টি জার্মপ্লাজমের মলিকুলার বৈশিষ্ট্যায়ণের এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে আলুর ৯ টি, গাছ-আলুর ৩ টি এবং পুদিনার ৩ টি জার্মপ্লাজম ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জার্মপ্লাজম সরবরাহ ও বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় এ কেন্দ্র থেকে জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৩৮৯৬ টি জার্মপ্লাজম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও গবেষকদের সরবরাহ করা হয়েছে।

সীড জিন ব্যাংকে মধ্য-মেয়াদী সংরক্ষণ (৪ হতে ৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)

সীড জিন ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ (-১৮ হতে -২২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)

ফিল্ড জিন ব্যাংকে ডুমুর সংরক্ষণ

ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে পুদিনা ও আলুর সংরক্ষণ

জার্মপ্লাজম অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ ও সংগ্রহকরণ

বিভিন্ন ধরনের বাঙ্গির সংগ্রহ

Loose erect primary branches (9.63%)

Loose drooping primary branches (1.48%)

জোয়ারের অংগসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যায়ন

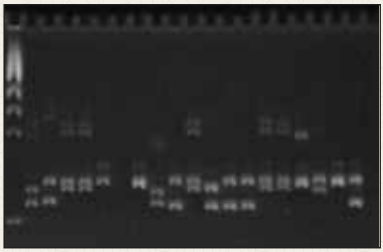

আমের মলিকুলার বৈশিষ্ট্যায়ন

মৃত্তিকা বিজ্ঞান গবেষণা

মাটি বাংলাদেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। সঠিক উপায়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করাই মাটি গবেষণার মূল লক্ষ্য। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য গবেষণা বিভাগ। বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও সার গবেষণায় এই বিভাগ শুরু থেকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। গবেষণার মাধ্যমে অত্র বিভাগ এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা কৃষকের মাঠে সফল ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ চারটি শাখার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এগুলো হলো ক) মৃত্তিকা রসায়ন শাখা খ) মৃত্তিকা পদার্থ শাখা গ) মৃত্তিকা অণুজীব শাখা ঘ) মৃত্তিকা অনুপুষ্টি শাখা।

জৈব আর্বজনা থেকে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার উৎপাদন কলাকৌশল

ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার উৎপাদন বর্তমানে কৃষি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জৈব উচ্ছিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের একটি যুগোপযোগী পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ। হজম

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসিনা ফেটিডা (Eisenia fetida) জাতের কেঁচো গোবর ও রান্নাঘরের পচনশীল আর্বজনাকে ভার্মিকম্পোস্টে রূপান্তরিত করে। বাংলাদেশে ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদনকারী কম্পোস্টার কেঁচোর জাতগুলির মধ্যে এসিনা ফেটিডা (Eisenia fetida) অধিক দ্রুততার সাথে বেশি পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে সক্ষম। এই সার তৈরিতে নানারকম পচনশীল জিনিস লাগে। এসব খেয়ে হজম প্রক্রিয়ায় কেচোঁ যে মল ত্যাগ করে, তাই ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার। অন্যান্য জৈবসারের তুলনায় এ সার অধিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ কারণ হজম প্রক্রিয়ায় উপকারি অনুজীব ছাড়াও কেঁচোর শরীর নিঃসৃত রস এটাতে মিশ্রিত থাকে যা এর পুষ্টিমান বাড়িয়ে দেয়। সচোরাচর গোবর দিয়ে এই সার তৈরি করা হয়। বর্তমানে গোবরের অপ্রতুলতায় ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে গোবর ও রান্নাঘরের পচনশীল আর্বজনার মিশ্রণ থেকে উৎপাদিত ভার্মিকম্পোষ্ট বেশি পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ।

ফসল উৎপাদনে বায়োস্লারীর ব্যবহার

বায়োগ্যাস প্রকল্প বাংলাদেশে একটি নতুন প্রযুক্তি যার ফলশ্রুতিতে বায়োস্লারী জৈব সার প্রস্তুত হয়। এ্যানারবিক পরিবেশে প্রস্তুত হওয়ার প্রেক্ষিতে বায়োস্লারী জৈব সারে উদ্ভিদ পুষ্টিমান বেশি থাকায় সাধারণ গোবর বা মুরগির বিষ্ঠার চেয়ে উৎকৃষ্ট। বায়োস্লারী জৈব সার সাধারণত গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, কচুরীপানা ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয়। ৩ টন মুরগির বিষ্ঠা বায়োস্লারী অথবা ৫ টন গোবর বায়োস্লারী ব্যবহার করে বাঁধা কপি (৯৮ টন/হেক্টর) ও ফুল কপির (৫৭ টন/হেক্টর) সর্বোচ্চ উৎপাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ফুলকপি ও বাঁধা কপির উপর বায়োস্লারী জৈব সারের প্রভাব পরীক্ষা করে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

বিষয়	বিবরণ
জৈবসার	ভার্মিকম্পোষ্ট বা কেঁচো সার
জাত	এসিনা ফেটিডা (*Eisenia fetida*)
চাড়ি বা গামলা	২ হাত চওড়া ও ২ হাত লম্বা সিমেন্টের ৮টি চাড়ি
কেঁচোর পরিমাণ	২ কেজি ৮টি চাড়ির জন্য অথবা ২০০টি কেঁচো প্রতি চাড়ির জন্য (১ কেজি = ১০০০টি পূর্ণবয়স্ক কেঁচো
বেডিং তৈরির উপকরণ	গোবর, রান্নাঘরের জৈব্য আর্বজনা
গোবর ও আবর্জনা পচানো	কাঁচা গোবর ১০-১২ দিন মুক্ত অবস্থায় পঁচানো। পচনশীল আবর্জনা বেছে মাটির গর্তে বা কালো পলিথিনে ভরে মুখ বন্ধ করে বায়ুরোধী অবস্থায় ৭/৮ দিন ৫০-৬০ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। পলিথিনে মুখ বন্ধ অবস্থায় রাখলে উক্ত পরিমাণ তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়।
কেঁচো সংগ্রহ	বিভিন্ন এনজিও বা কৃষক পর্যায়ে কেঁচো সংগ্রহ করে গোবরে রাখলে কেঁচো এই গোবর খেয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করবে।
কম্পোস্টের বেড তৈরি	৩ঃ১ অনুপাতে পচানো গোবর, রান্নাঘরের গাজনকৃত জৈব আর্বজনা একত্রে মিশেয়ে ৮টি চাড়িতে ভরে বেড তৈরি করে প্রতিটি চাড়িতে পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী কেঁচো ছেড়ে দিতে হবে। চাড়িগুলি পাটের চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ২/১ দিন পর পর দেখতে হবে চাড়ির উপরের মিশ্রিত আবর্জনা শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা। শুকিয়ে গেলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা কালচে বাদামী রং ধরলে পানি দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে।
সার সংগ্রহ	মিশ্রিত আবর্জনা যখন শুকিয়ে চায়ের গুড়ার মত ঝুরঝুরা হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে সার তৈরি হয়ে গেছে। ৭০-৮০ দিনের মধ্যে সার তৈরি হয়ে যায়। সাধারণত ৬ মাসে কেঁচোর সংখ্যা ৪-৫ গুণ হয়। পরবর্তীতে তাই সার তৈরিতে কম সময় লাগে।
ভার্মিকম্পোষ্ট চালা পদ্ধতি	চালুনী দিয়ে চেলে সার, কেঁচো ও কেঁচোর ডিম আলাদা করা হয়।
সার উৎপাদন	সাধারণত ২০ কেজি পচানো বেডিং আবর্জনা থেকে ১১ কেজি সার পাওয়া যায়।
মূল্য	প্রতি কেজি কেঁচো সার ১৫-২০ টাকা এবং প্রতি কেজি কেঁচো ২০০০ টাকা।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ	
ফসল	ফুলকপি ও বাঁধা কপি	
জাত	স্নো হোয়াইট ও এঁলাস - ৭০	
জমি ও মাটি	উচু মাঝারী উচু এটেল মাটি	
রোপণের সময়	মধ্য নভেম্বর	
রোপণ পদ্ধতি	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেন্টিমিটার ও গাছ থেকে গাছ ৪৫ সেন্টিমিটার	
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	বাঁধা কপি	ফুলকপি
ইউরিয়া	২৫০	৩৯০
টিএসপি	১৩৫	১৩৫
এমওপি	১২০	১৩০
জিপসাম	৮০	১১০
বরিক এসিড	৬	৬
বায়োল্লারী জৈব সার	৩ টন/হেক্টর	৩ টন/হেক্টর

বিষয়	বিবরণ
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সুপারিশকৃত ১/৩ ইউরিয়া, সম্পূর্ণ জৈব সার, টিএসপি, এমওপি এবং জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড কিছু শুকনা ও ঝুরঝুরে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সম্পূর্ণ জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। বাকি ২/৩ ইউরিয়া সার চারা রোপণের ২৫ ও ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি	জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে রোপনের পর হালকা সেচ দিতে হবে।
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা	অতি বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ফসল সংগ্রহ	মধ্য ফেব্রুয়ারি - মধ্য মার্চ
ফলন	৫৫-৫৮ টন/হেক্টর ৯৫-১০০ টন/হেক্টর

ভুট্টার দানা গঠনে চুন ও বোরন সারের প্রভাব

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ভুট্টা ফসলেচিটা দেখা দেওয়ায় ভুট্টার ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। উত্তরাঞ্চলের মাটি অম্লধর্মী। উত্তরাঞ্চলে কৃষকের চিটা সমস্যাকবলিত মাঠে হাইব্রিড ভুট্টা নিয়ে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে অম্লীয় মাটিতে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানসমূহ বিশেষত বোরন উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য অবস্থায় থাকে না বিধায় উদ্ভিদের অভাবজনিত লক্ষণ "ভুট্টায় চিটা" মারাত্মক আকার ধারণ করে। অম্লীয় মাটিতে বোরনের অভাবে ভুট্টায় দানা গঠিত হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভুট্টার দানা গঠনের জন্য বোরনের প্রয়োজন। এছাড়াও মাটির অনুর্বরতা, নিবিড় শস্য চাষ এবং অসুষম মাত্রার সার প্রয়োগ এর সাথে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় যদি হেক্টরপ্রতি ২ টন চুন ও ২ কেজি বোরন সার প্রয়োগ করা যায়, তবে ভুট্টার ফলন হেক্টরপ্রতি শতকরা ৩৬ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব (৮.৮৮ টন/হেক্টর) যা অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক ।

ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার

ঝাড়শিম প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি লিগিউম জাতীয় সবজি। চট্টগ্রাম, গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, ঠাকুরগাঁওসহ বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে ঝাড়শিম চাষাবাদ করা যায়। এই ফসল চাষে জমিতে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম

অণুজীব সার ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। অণুজীব সার বা জীবাণু সার এক ধরনের বিশেষ উপকারী অণুজীবের দ্বারা তৈরি করা হয়। এরা শিম জাতীয় গাছের সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে। শিম জাতীয় গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে সংশ্লিষ্ট গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	ঝাড়শিম
জাত	বারি ঝাড়শিম-১
জমি ও মাটি	উর্ববর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ
বপনের সময়	মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	৫০ থেকে ৬০
বপন পদ্ধতি	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি
রাইজোবিয়াম স্ট্রেইন	বারি আরপিভি-৭০১
সারের মাত্রা (হেক্টরপ্রতি)ঃ রাইজোবিয়াম অণুজীব সার টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট গোবর	 ১.৫ কেজি ২০৪ কেজি ১৬০ কেজি ১১২ কেজি ১৪ কেজি ৫ টন
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	বারির মৃত্তিকা অণুজীব শাখা কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি আরপিভি-৭০১ স্ট্রেইন দিয়ে তৈরিকৃত অণুজীব সার প্রতি হেক্টরে ১.৫ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। পরিমাণমত গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মেশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনা জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ	প্রয়োজন মত
ফসল সংগ্রহ	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি
ফলন	১৩-১৪ টন/হেক্টর

চীনাবাদাম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সারের ব্যবহার

চীনাবাদাম প্রোটিন ও তৈল সমৃদ্ধ একটি ফসল। গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ বেলে দোআঁশ মাটিতে চীনাবাদাম চাষ করা যায়। এই ফসল চাষে জমিতে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। অণুজীব সার বা জীবাণু সার এক ধরনের বিশেষ উপকারী অণুজীবের দ্বারা তৈরি করা হয়। এরা শিম জাতীয় গাছের সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে। শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। শিম জাতীয় গাছের উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে সংশ্লিষ্ট গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।

বিষয়	বিবরণ
ফসল	চীনাবাদাম
জাত	বারি চীনাবাদাম-৬
জমি ও মাটি	বেলে দোআঁশ বা চর অঞ্চলের বেলে মাটি
বপনের সময়	রবি: কার্তিক-অগ্রহায়ণ, খরিফ-১: ফাল্গুন -চৈত্র, খরিফ-২: শ্রাবণ - ভাদ্র
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	১০০ থেকে ১১০ (খোসাসহ)
বপন পদ্ধতি	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি
রাইজোবিয়াম স্ট্রেইন	বারি আরএএইচ -৮০১, বারি আরএএইচ -৮০২, বারি আরএএইচ-৮০৩
হেক্টরপ্রতি সারের মাত্রা রাইজোবিয়াম অণুজীব সার টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট গোবর	 ১.৫ কেজি ১১২ কেজি ৮৪ কেজি ১০২ কেজি ১৪ কেজি ৫ কেজি ৭ টন/হেক্টর
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	বারির মৃত্তিকা অণুজীব শাখা কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি আরএএইচ -৮০১, বারি আরএএইচ -৮০২, বারি আরএএইচ-৮০৩ স্ট্রেইন দিয়ে তৈরিকৃত অণুজীব সারের যে কোন একটি প্রতি হেক্টরে ১.৫ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। পরিমাণমত গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ	প্রয়োজনমত
ফসল সংগ্রহ	রবিঃ বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ
ফলন	রবি: ২.৫ - ৩ এবং খরিফ: ২ - ২.৫ টন/হেক্টর

টমেটো-মুগডাল-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের ফলন বৃদ্ধিতে ভূমি কর্ষণ এবং জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের প্রভাব

পাওয়ার টিলার দ্বারা মধ্যম গভীরতায় (১০-১২ সেমি) ভূমি কর্ষণ পূর্বক সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে জৈব ও অজৈব সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করলে টমেটো-মুগডাল-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের ফলন প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় (১৭-২৪%) বৃদ্ধি পায় । এছাড়া মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা (২.৬-৩.৫%) উন্নত হয় । ধীরে ধীরে রন্ধ্র পরিসর, মাঠ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মৃত্তিকার আয়তনী ঘনত্ব কমতে থাকে । অন্যদিকে মাটির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। এলাকা: বৃহত্তর যশোর (AEZ - 11)

সুপারিশ

ক) জাত

টমেটো: বারি টমেটো- ৯, মুগডাল: বারি মুগ -৬

রোপা আমন: ব্রি ধান-৩২

খ) কর্ষণ:

মধ্যম গভীরতার কর্ষণ (১০-১২ সেমি) গভীর

গ) সার:

টমেটো: N230 P80 K100 S20 B2 kg/ha + Cowdung 10t ha-1, **মুগডাল:** N21 P18 K18 kgha-1, **রোপা আমন:** N70 P30 K60 S20 Zn4 kg ha-1

প্রচলিত সনাতনী পদ্ধতিতে (Indigenous method) পাহাড়ের ঢালে আদা, হলুদ, কচু, ধান চাষের ফলে মৃত্তিকা অবক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ

খাগড়াছড়ি অঞ্চলে (AEZ–29) সনাতনী পদ্ধতিতে (Indigenaus method) পাহাড়ের ঢালে (৬-১৬%) আদা, হলুদ, কচু, ধান (ঝুম) চাষ করা হলে মৌসুমী বৃষ্টির পানি প্রবাহের ফলে প্রতি বছর ২২.৭, ১৬.৫, ১২.০ এবং ৭.৯ টন/ হেক্টর উর্বর মৃত্তিকা (Top soil) ধুয়ে অবক্ষয় হয়। ধুয়ে যাওয়া উক্ত মৃত্তিকার সাথে হেক্টর প্রতি ১৫৩-৪১০ কেজি/হেক্টর জৈব কার্বন,

১৬-৪০ কেজি নাইট্রজেনসহ উদ্ভিদের অন্যান্য পুষ্টি উপাদান অপচয় হয়।

পাহাড়ী অঞ্চলে অধিক ঢালে >১০% সনাতনী পদ্ধতিতে আদা, হলুদ, কচু কিংবা ঝুম পদ্ধতিতে ধান চাষ করা মৃত্তিকা ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। উক্ত অঞ্চলে কন্টুর, টেরাছি, ম্যাথ চাষ মডেল অবলম্বন পূর্বক কৃষি কাজ করা হয় বিধায় উঁচু ঢালে ফল ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ লাগানো উচিৎ।

মাটির নিম্নস্তরে (Sub soil) খড়ের আস্তরণ (Sub surface mulch) প্রয়োগে লবণাক্ততা দূরীকরণ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

অধিক লবণাক্ত মাটির নিম্নস্তরে (৫০ সেমি গভীরে) শেষ চাষের পর ৫ সে.মি. পুরুত্বের খড়ের আস্তরণ দিয়ে মালচিং করলে ঊর্ধ্বগামী কৈশিকটান হ্রাসের ফলে উক্ত মাটির লবণাক্ততার তীব্রতা ১৪-৩৭% পর্যন্ত কমানো যায়। খরা মৌসুমে (মার্চ-মে) যেখানে আর্দ্রতা নুয়াঙ্কের (Wilting point) নিচে চলে যায় সেখানে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ১৬-৫৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। এমনকি তীব্র লবণাক্ত মাটিতে (EC 12-15 dS/m) যেখানে ফসল ফলানো দূরূহ সেখানে মিষ্টি কুমড়া জাতীয় সবজির ১০-১২ টন ফলন পাওয়া সম্ভব।

এলাকা: সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, নোয়াখালীসহ উপকূলীয় অঞ্চল।

লাইসিমিটারের সাহায্যে শস্য সহগ (কপ) নির্ণয়ের মাধ্যমে হাইব্রিড ভুট্টার সেচের পানির পরিমাণ নির্ধারণ এবং চুয়ানো পানিতে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের অপচয়ের পরিমাণ পরিমাপকরণ

হাইব্রিড ভুট্টার জীবনচক্রের প্রাথমিক বর্ধনশীল, মোচাধারণ ও ফলন পর্যায়ের শস্য সহগ যথাক্রমে ০.৩৬, ০.৮৪, ১.৩২ ০.৭৬ (AEZ–28) এর জন্য নির্ণিত হয়েছে । খরিপ-১ মৌসুমে উক্ত শস্য সহগের মান তুলনামূলকভাবে কম । শস্য সহগের মান এর সাথে উক্ত

এলাকার শস্য প্রস্বেদনের মান ব্যবহার করে হাইব্রিড ভুট্টার সেচের পানির পরিমাণ জানা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে হাইব্রিড ভুট্টার সেচের পানি চুয়ানোর ফলে লিটার প্রতি ১.২৮ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ১৩.৮৯ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ৩২.৬৪ মিলিগ্রাম সালফার অপচয় হয়।

চার ফসল ভিত্তিক ফসল ধারা

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি অধিক এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসাবাস করে প্রায় ১১০০ জন। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৮৫.২ লক্ষ হেক্টর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতি বছর জমির পরিমাণ কমছে প্রায় ১% হারে। এক ফসলি জমির পরিমাণ ২৪.২ লক্ষ হেক্টর, দুই ফসলি জমির পরিমাণ ৩৮.৪১ লক্ষ হেক্টর, তিন ফসলি জমির পরিমাণ ১৬.৪২ লক্ষ হেক্টর এবং ফসলের নিবিড়তা ১৯১%। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি। আর এই বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল জাত, উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনা এবং একক জমিতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা। একমাত্র উন্নত ফসলধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা ১৯১% থেকে ৪০০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। ধান ভিত্তিক ফসল ধারায় স্বল্প মেয়াদী অন্য ফসল সমন্বয় করে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব।

ফসলধার : রোপা আমন - সরিষা - বোরো - রোপা আউশ

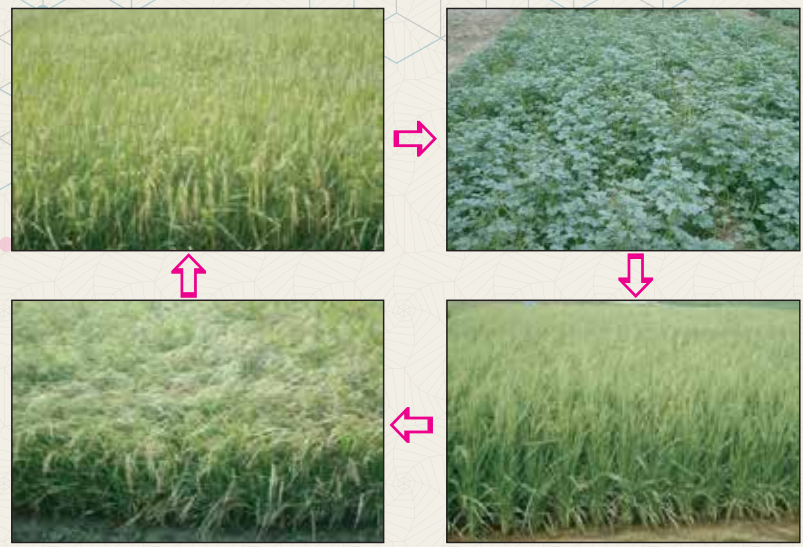

ফসলধার : রোপা আমন - আলু - বোরো - রোপা আউশ

ফসলধার : রোপা আমন - সরিষা - মুগ - রোপা আউশ

কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণা

বর্তমানে ডিজেল ইঞ্জিনের দাম তুলনামূলক কম হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও চাষাবাদের কাজে পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হচ্ছে। সেদিক বিবেচনা করে বারি বিজ্ঞানীরা পাওয়ার টিলারের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েক ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন বীজ বপন যন্ত্র, আলু উত্তোলন যন্ত্র, ধান ও গম কর্তন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বারি উদ্ভাবিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, শুকনা জমি নিড়ানী যন্ত্র, শস্য ঝাড়াই যন্ত্র, আলু রোপণ যন্ত্র, আলু উত্তোলন যন্ত্র, আলু গ্রেডিং যন্ত্র, আম পাড়া যন্ত্র, আম শোধন যন্ত্র ইত্যাদি কৃষক পর্যায়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। বারি বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ৫৩ ধরনের উন্নত এবং লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে।

বিএআরআই উদ্ভাবিত উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব গবেষণা

জলবায়ু পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে চলমান গবেষণা কার্যক্রম এবং উদ্ভিদ শারীরতাত্ত্বিক বিভিন্ন মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের উদ্দেশ্য হলো নিম্ন বর্ণিত গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা-

- উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্য এবং প্রক্রিয়া (Function and process) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- সৌরবিকিরণ, পুষ্টি, পানি ইত্যাদির ব্যবহার কার্যকারিতা (Use efficiency) বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ ও উৎপাদন ক্ষমতা উন্নয়ন করা।
- বিভিন্ন ফসলের ফলন বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক ও প্রাণরাসায়নিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা।
- বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ও উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত বাছাইকরণ ।
- প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী জাতসমূহের শারীরতাত্ত্বিক ও প্রাণরাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা।
- উদ্ভিদের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ফলন বৃদ্ধিতে খনিজ পুষ্টি এবং হরমোন এর প্রভাব নির্ধারণ করা।

কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (এএসআইসিটি)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ সকল গবেষণা কাজে সংখ্যাত্ত্বাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যকীয় হওয়ায় গবেষণা কাজে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিভাগ বিভিন্ন কেন্দ্র বিভাগের গবেষণা তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে কার্যকারী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে জটিল সংখ্যাত্ত্বাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের Field plot technique, Sampling technique, Climate change issue সহ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজে বিজ্ঞানীদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন এনালাইসিস যেমন, RCBD, Split plot, Factorial, Regression, Correlation, Multivariate analysis, Path analysis ইত্যাদি করে থাকে। এ সকল এনালাইসিস করার জন্য সাধারনত R, SAS, Cropstat ইত্যাদি statistical software ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা যা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও তৎসম্পর্কিত সফটওয়্যার, তথ্য সংরক্ষণ, সিস্টেম ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য প্রবাহের যুগ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিটে তথ্যের অবাধ

এএসআইসিটি ভবন

প্রবাহ ও স্বচ্ছতা আনয়নের নিমিত্ত উপযুক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকারের বেশ কিছু ভিশন ২০২১ (ডিজিটাল বাংলাদেশ) এর সাথে সঙ্গতি রেখে বিএআরআই-তে আইসিটি সংক্রান্ত বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত এবং প্রযুক্তি সমূহের তথ্যসহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য ওয়েব পোর্টালে (www.bari.gov.bd) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং জাতীয় ওয়েব পোর্টালের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ভোক্তাদের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মাধ্যমে ই-কৃষি ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।

সম্প্রতি বিএআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের তথ্য কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য করার জন্য "কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার" নামে মোবাইল অ্যাপ্স তৈরি করেছে। মূলত এটি কৃষি প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাপ্সটি স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীরা তাদের মোবাইল হ্যান্ডসেটে ব্রাউজ করে তথ্য নিতে পারবেন। এই অ্যাপস্টির মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, বিশেষ করে রোগ বালাই, পোকামাকড় ও সার ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। অধিকতর তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন জানাতে পারবেন এবং এসএমএস, ই-মেইল ও অ্যাপ্সে উত্তর পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে ফ্রি কলের মাধ্যমে পরামর্শ নেওয়া যাবে। ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের তথ্য বিনামূল্যে, স্বল্প মূল্যে ও সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে। এই অ্যাপ্সটি BARI Application "কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার" নামে Google play store হতে Android base mobile এ ডাউনলোড করে অফলাইনে ব্যবহার করা যাবে। স্মার্ট SHAREit এর মাধ্যমে অফলাইনে অন্যান্য মোবাইল অ্যাপসটি store করা যাবে। এছাড়াও Online এ স্মার্টফোন (Android/windows/iOS) এর ব্রাউজারে baritechnology.org/m ঠিকানা থেকে কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার শীর্ষক মোবাইল ওয়েব অ্যাপসটি ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও BARI এর উদ্ভাবিত বিভিন্ন Crop variety এর তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Online based system development এর কাজ চলমান রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স এর আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে পেপারলেস অফিস করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে অত্র বিভাগে Management Information System (MIS) ল্যাবরেটরি গঠন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে পাঁচ মডিউল বিশিষ্ট বিএআরআই এর অটোমেশন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এবং ৯(নয়) মডিউল বিশিষ্ট বিএআরসি'র সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিএআরআই প্রশাসনিক, আর্থিক, গবেষণা ও সেবামূলক কার্যক্রম ই-গভার্নেন্স এর আওতায় আনার লক্ষে এএসআইসিটি বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

জীব প্রযুক্তি গবেষণা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর চলমান গবেষণা কর্মসূচী জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে জীব প্রযুক্তি বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা হয়। পূর্বে এই বিভাগে শুধুমাত্র উচ্চ মূল্যের বাণিজ্যিক ফসলের মাইক্রোপ্রোপাগেশনের জন্য টিস্যু কালচার পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। বর্তমানে এই বিভাগে প্রধানত তিন ধরণের গবেষণা যেমন- টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মার্কার অ্যাসিস্টেড ব্রিডিং এর উপর গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

আধুনিক মলিকুলার জেনেটিক্স ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণাগার সমৃদ্ধ অফিস ভবন

আধুনিক গ্রিন হাউজ

সরকারী অর্থায়নে ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে এই বিভাগে একটি অত্যাধুনিক গবেষণাগার এবং ট্রান্সজেনিক ফসল গবেষণার জন্য একটি গ্রীনহাউজ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর জিন স্থানান্তর, মার্কার অ্যাসিস্টেড ব্রিডিং ও মলিকুলার ক্যারেকটারাইজেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

জীব প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ প্লাসমিড কনস্ট্রাক্ট উদ্ভাবনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। নতুনভাবে উদ্ভাবিত ভেক্টর কনস্ট্রাক্ট বারি মুক্তায়িত বিভিন্ন ফসলের জাত উন্নয়নের গবেষণা ও জিন স্থানান্তর পদ্ধতির প্রটোকল উদ্ভাবনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

টিস্যু কালচার

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল যেমন- কলা, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, নারিকেল, আঙ্গুর, বেগুন, কাকরোল, আদা, তরমুজ, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, রজণীগন্ধা, অর্কিড, গ্লাডিওলাস, স্ট্রবেরি ও পটলের চারা উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রটোকল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত স্ট্রবেরি ও কলার চারা

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত উক্ত ফসলসমূহের চারা মাঠ পর্যায়ে সফলতার সাথে পরীক্ষা করা হয়েছে যা কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

বর্তমানে এ বিভাগে বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের গাছের মধ্যে জিন স্থানান্তর ও জিন ক্লোনিং এর প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। এ বিভাগের বিজ্ঞানীরা নতুন ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবনের জন্য জিন সনাক্তকরণ ও জিন ক্লোনিং করা এবং ট্রান্সজেনিক ফসলের ট্রান্সজেনেসিটি পরীক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া ABSP-II প্রকল্পের সহায়তায় বেগুনের নয়টি ও আলুর দুইটি জাতের উপর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা চালু রয়েছে। বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা (BSFB) প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক বিটি বেগুন এর চারটি জাত মুক্তায়িত হয়েছে এবং আরও পাঁচটি জাত মুক্তায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

বারি বিটি বেগুন-১

বারি বিটি বেগুন-২

বারি বিটি বেগুন-৩

বারি বিটি বেগুন-৪

আলুকে লেইট ব্লাইট রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য USAID এর অর্থায়নে ABSP-II প্রকল্পের অধীনে এবং উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীবৃন্দের সহায়তায় বাংলাদেশের দুটি জনপ্রিয় জাত বারি আলু-৭ ও বারি আলু-৮ এর মধ্যে বন্য জাতের আলু থেকে সংগৃহীত লেইট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী RB জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। আলুর সেই ক্লোনগুলোর অগ্রানমী ও জিনের ইপিকেসী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ ও সংরক্ষিত মাঠে কয়েক বছর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তাছাড়া রেগুলেটরীর প্রয়োজন

মাফিক বর্তমানে আরও কিছু গবেষণার জন্য RB জিন সমৃদ্ধ ক্লোনটি নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজে পরীক্ষাধীন আছে যা ভবিষ্যৎ লেইট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী জাত হিসেবে অবমুক্তায়িত করা হবে।

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত ট্রান্সজেনিক আলুর চারা

মাঠ পর্যায়ে ট্রান্সজেনিক আলুর জাতের সাথে নন-ট্রান্সজেনিক জাতের তুলনামূলক পরীক্ষা

মলিকুলার ক্যারেকটারাইজেশন

বর্তমানে জীব প্রযুক্তি বিভাগে বিভিন্ন ফসলের মলিকুলার ক্যারেকটারাইজেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা তৈরী করা হয়েছে। আধুনিক মলিকুলার জেনেটিক্স বিদ্যা বিভিন্ন ফসলের জেনেটিক মেকআপ, ক্যারেকটারাইজেশন ও ফিংগার প্রিন্টিং এর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। জীব প্রযুক্তি বিভাগ উন্নত জাতের ফসল উদ্ভাবনে বিএআরআই এর অন্যান্য বিভাগসমূহকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের মলিকুলার ক্যারেকটারাইজেশন সম্পাদনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে টমেটো ভাইরাসের ৩২টি আইসোলেটের সম্পূর্ণ জেনোম সিকোয়েন্সের কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা ভবিষ্যতে এই রোগ প্রতিরোধী টমেটোর জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ফসল যেমন- বেগুন, পটল, কলা ইত্যাদির জিনগত বৈচিত্রতা পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষের জন্য মার্কার এসিস্টেড ব্রিডিং এর মাধ্যমে লবণাক্ততা সহিষ্ণু গমের জাত উদ্ভাবনের জন্য এ বিভাগের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

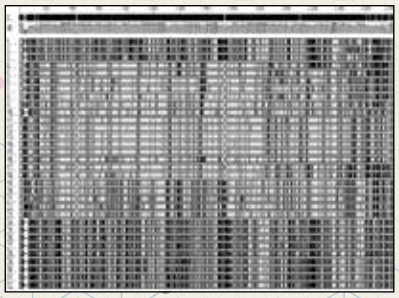

টমেটোর ভাইরাস শনাক্তকরণ ও ক্যারেকটারাইজেশন

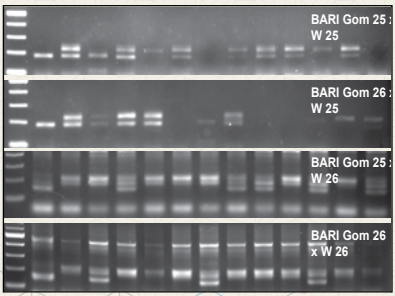

লবণাক্ততা সহিষ্ণু গমের জিন ট্রান্সফার

গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। গমে গ্লুটেন প্রোটিন এর উপস্থিতি পাউরুটি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত ধারনা করা হয় বাংলাদেশে প্রচলিত গমের জাতসমূহে গ্লুটিনের মাত্রা কম তাই এগুলো পাউরুটি তৈরিতে উপযোগী নয়। জীব প্রযুক্তি বিভাগ এর বিজ্ঞানীগণ অ্যালিল স্পেসিফিক মার্কার ব্যবহার এর মাধ্যমে গবেষণা করে দেখেছেন যে, বারি উদ্ভাবিত গমসমূহে গ্লুটেন সন্তোষজনক মাত্রায় উপস্থিত। এ গবেষণার ফলে পাউরুটি তৈরির জন্য গমের আমদানি নির্ভরশীলতা কমবে। ভবিষ্যতে পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথে মানানসই ফসলের জাত উদ্ভাবনে এ বিভাগের বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অবদান রাখবে।

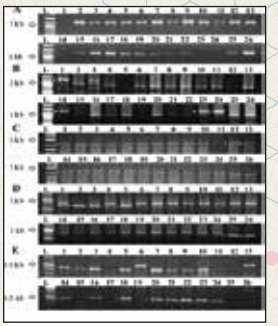

২৬টি বারি গমের জাতের HMV-GS এলিলসমূহের PCR অ্যাম্প্লিফিকেশন

বীজ প্রযুক্তি গবেষণা

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের মূল অর্থনীতি, উন্নয়ন সবটাই নির্ভর করে কৃষির উপর। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বীজের গুরুত্ব সকল উপকরণের চেয়ে বেশী। বীজই হলো একমাত্র সেই উপকরণ যা মানসম্পন্ন না হলে অন্যান্য উপকরণাদির ব্যবহার ফলপ্রসূ হয় না। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে হলে মানসম্পন্ন বীজকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বীজের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৮ সালে বীজ প্রযুক্তি বিভাগ নামে এই বিভাগের জন্ম হয়। বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। গবেষণা কর্মকর্তা, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকদের আধুনিক মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন সভা সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ প্রদান অত্র বিভাগের বিজ্ঞানীদের অন্যতম দায়িত্ব। কৃষকের মাঠে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরীক্ষা, পরিদর্শন ছাড়াও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বীজ উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশলের উপর মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়ে থাকে। বীজ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি এখানে কর্মরত বিজ্ঞানীরা ভালো মানের বীজ উৎপাদনের এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। কৃষক পর্যায়ে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা, বিভিন্ন বীজের সতেজতা পরীক্ষা, বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া গম বীজ কি ভাবে সংরক্ষণ করা যায়, ফেলন, মুগবীন, সয়াবিন ইত্যাদি ফসলেন বীজ বপনের এবং কর্তনের সঠিক সময় নির্ধারণ, বিভিন্ন ফসল যেমন চীনাবাদাম, মুগবীন, খেসারী, মসুর ইত্যাদি বীজ হিসাবে সংরক্ষন পদ্ধতি। এগুলো বীজ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন। শিম, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, মিষ্টি মরিচ, বেগুন এই ফসলগুলোর বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিগত গবেষণা

শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি হলো কৃষি পণ্যসমূহ সংগ্রহ থেকে শুরু করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে কৃষিপণ্য গুণগত ও পরিমাণগত ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় এবং এই পণ্যসমূহ থেকে দীর্ঘস্থায়ী, গুণমানসমৃদ্ধ এবং সুস্বাদু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ও পুষ্টিমান সংযোজন করা যায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি ও বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে দানাশস্য, তৈলবীজ, ডালশস্য, ফল, ফুল, কন্দাল ফসল প্রভৃতি কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির চিত্র হতাশাজনক, যা মূলত চাষাবাদের আদিম পন্থা অনুসরণ করে, যার কারণে পণ্যসমূহের বাহ্যিক ও গুণগত মানের ব্যাপক অবনয়ন ঘটে। এক জরিপে দেখা যায়, দেশে দানাশস্যের ঘাটতি বার্ষিক উৎপাদনের শতকরা ৮-১০ ভাগ, যেখানে সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতকরা ১২-১৫ ভাগ নষ্ট হয়। অন্যদিকে একই কারণে উদ্যান ফসলের ক্ষতি শতকরা ২৫-৪০ ভাগ। আমাদের দেশে কৃষি পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন ৫৫.৭৪ মিলিয়ন টন এবং বার্ষিক ক্ষতি প্রায় ৯.৯৩ মিলিয়ন টন যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫৫৪৮ মিলিয়ন টাকা। তাই বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের বিপরীতে সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রচলিত প্রযুক্তিসমূহের উন্নয়ন এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে উদ্যান ও দানা শস্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে নির্দেশিত ফসলের সংগ্রহোত্তর স্থানান্তরকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই বিভাগ মূলত তাজা ও প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের সংগ্রহোত্তর স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষণ, গুণমান নির্ণয় ও মান সমৃদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিরামহীন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

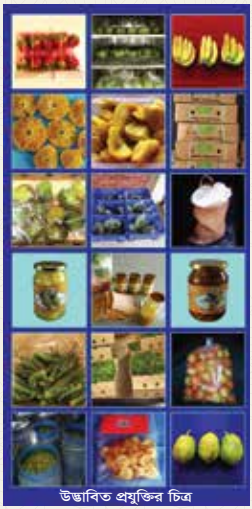
উদ্ভাবিত প্রযুক্তির চিত্র

বিভাগের কর্মপরিধি

- আদিষ্ট কৃষি পণ্যের স্থানান্তরকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণের নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে কৃষি ব্যবসা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য

- খাদ্যশস্য ও পচনশীল শস্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় এবং তা কমিয়ে আনতে গবেষণার অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতকরণ।
- খামার, ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা পর্যায়ে উন্নত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়া।
- তাজা, প্রক্রিয়াজাতকৃত ও সংরক্ষিত কৃষি পণ্যের গুণমান নির্ণয় এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের সংরক্ষণকাল ও মান বৃদ্ধিকরণ।
- সহজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকের আয় বৃদ্ধিকরণ।

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি বিষয়ক গবেষণা

বাংলাদেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বালাই দমন করে ফসল রক্ষা করা অতীব জরুরি। বালাইয়ের মধ্যে অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি (ইঁদুর, পাখী ও কাঁঠবিড়ালী) মাঠ ফসল উৎপাদন এবং গুদামজাত শস্য রক্ষণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা। বিভিন্ন ধরনের অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি দ্বারা বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণি বিভাগ সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে। এদেশে অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণির চিহ্নিতকরণ, ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ এবং যথাযথ দমন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের উপর গবেষণা করা হয়ে থাকে। অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ইঁদুর জাতীয় প্রাণি, পাখি, শিয়াল এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এইউএসএইডের (USAID) সহায়তায় ইঁদুর সহ অন্যান্য অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণীর গবেষণা কর্মকাণ্ড ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু হয়। তখন থেকে আমেরিকার Denver Wild Life Research Centre এদেশে অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি বিভাগে গবেষণার জন্য কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রজাতির অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডি প্রাণির চিহ্নিতকরণ, ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন এবং প্রাণির জীবনচক্র (Biology) এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে কিছু গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেন। এ সহযোগিতা ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৯৮ সালের পূর্বে এ

প্লেইন সিট ব্যবহারের মাধ্যমে নারিকেল গাছে ইঁদুর দমন

বিভাগটিকে কীটতত্ত্ব বিভাগের অধীনে একটি শাখা ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ১৯৯৮ সালে অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণি বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলী:

- বিভিন্ন প্রজাতির অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি সংগ্রহ, জরিপ, সনাক্তকরণ এবং ক্ষতির ধরন এবং ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন।
- ক্ষেতের ফসল, গুদামজাত সামগ্রী ও বসতবাড়ীর জন্য যুগপোযোগী সমন্বিত অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি দমন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

ভাসমান কৃষি গবেষণা

"ভাসমান কৃষি" বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্লাবিত/জলমগ্ন এলাকার একটি সৃজনশীল ফসল উৎপাদন পদ্ধতি। প্লাবিত/জলমগ্ন অবস্থার সাথে অভিযোজনের জন্য স্থানীয় কৃষকেরা ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে "ভাসমান কৃষি" পদ্ধতিতে (যা স্থানীয়ভাবে ভাসমান/ধাপ চাষ নামে পরিচিত) ফসল (বিশেষ করে সবজি ও মসলা) উৎপাদন করে আসছে। বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন- মিয়ানমার, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, নেদারল্যান্ড, পেরু এবং মেক্সিকোতেও ভাসমান কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণত গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর এবং বরিশাল জেলায় বর্ষাকালে নিচু জলমগ্ন এলাকাসমূহে মূলত ভাসমান চাষ হয়ে থাকে তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এ পদ্ধতির ব্যবহার খুবই সীমিত। গোপালগঞ্জে এবং বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় শুধুমাত্র কচুরিপানা দিয়ে তৈরি ভাসমান বেডে সাধারণত শাক-সবজী ও মসলা জাতীয় ফসলের চাষ করা হয়। অন্যদিকে বরিশালের বানারীপাড়া ও আগৈলঝরা এবং পিরোজপুরের নাজিরপুর ও নেছারাবাদ উপজেলায় কচুরিপানা, দুলালীলতা ও টোপাপানা দিয়ে তৈরি ভাসমান বেডে শাক-সবজী ও মসলা জাতীয় ফসলের চারা উৎপাদন করা হয়। "ভাসমান কৃষি" পদ্ধতির উপকরণ যেমন- কচুরিপানা, দুলালীলতা, টোপাপানা, শ্যাওলা, নারিকেলে ছোবড়ার গুঁড়া প্রভৃতি স্থানীয় ভাসমান বাজারে বিক্রি হয়। টোপাপানার উপর দুলালীলতা/শ্যাওলা দিয়ে প্যাঁচিয়ে বল বা *দোল্লা* তৈরি করে তার ভিতর সবজি/মসলার অঙ্কুরিত বীজ বা কচি চারা বপন/রোপণ করতে হয়। অঙ্কুরিত বীজ বা কচি চারাসহ বলটি ভাসমান বেডে স্থাপন করে সবজি/মসলার চারা উৎপাদন করা হয়। ভাসমান বেডে উৎপাদিত সবজি ও মসলার চারা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ ছাড়াও অন্যান্য জেলায়ও বিক্রয় হয়। এতে কৃষক ছাড়াও ভাসমান/ধাপ চাষের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত জনগোষ্ঠীর (পুরুষ ও মহিলা) অর্থ উপার্জন ও কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি পরিবেশ বান্ধব এবং বাংলাদেশের পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে কৃষি অভিযোজনের উপযোগী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে দক্ষিণাঞ্চলে ও সিলেটের হাওড়াঞ্চলে ভাসমান সবজি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণের

নির্দেশনা প্রদান করেন। তাই গবেষণার মাধ্যমে ভাসমান কৃষি ভিত্তিক আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি আবশ্যক। উল্লেখ্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাসমান কৃষি প্রযুক্তিকে "Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS)" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল-এ প্রচলিত ভাসমান কৃষি পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানীগণ ২০১৪ সাল থেকে সমন্বিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

"নন-টাইডাল ভাসমান বেড ও মাঁচা" প্রযুক্তিতে শসা চাষ

"নন-টাইডাল ভাসমান বেড ও মাঁচা" প্রযুক্তিতে লাউ চাষ

ভাসমান বেডে সবজির চারা উৎপাদন

ভাসমান বেডে বেগুনের মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন (বারি বিটি বেগুন-২)

"নন-টাইডাল ভাসমান বেড ও মাঁচা" প্রযুক্তিতে মিষ্টি কুমড়া চাষ

ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ

ভাসমান বেডে হলুদ চাষ (বারি হলুদ-৪)

ভাসমান বেডে মরিচের চাষ (বারি মরিচ-১)

প্লাস্টিক ড্রাম ভিত্তিক "ভাসমান বেড ও খাঁচা" প্রযুক্তির মাধ্যমে সমন্বিত সবজি ও মাছ চাষ

সামুদ্রিক শৈবাল গবেষণা

বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১০ কিলোমিটার যেখানে ২৫০০০ বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকা বিস্তৃত। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট-মার্টিন্ সপ্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া সামদ্রিক শৈবালের প্রধান আধার। প্রাপ্ত তথ্য মতে সেখানে প্রায় ১০২ গ্রুপের ২১৫ প্রজাতির শৈবাল রয়েছে। বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সামুদ্রিক শৈবাল গবেষণায় গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১০ প্রজাতির শৈবাল চাষ করা সম্ভব। শৈবাল চাষের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ ও শান্ত লোনাপানি সমৃদ্ধ সমুদ্র উপকূল। সামুদ্রিক শৈবালে প্রচুরপরিমাণে এন্টি অক্সিডেন্ট, বিটা কেরোটিনযুক্ত ভিটামিন এ, ভিটামিন বি-১২, ভিটামিনসি, ডি, ই এবং কে রয়েছে। সামুদ্রিক শৈবাল মানবদেহে উচ্চ রক্তচাপ কমায়, স্বল্প কোলেস্টরেল বজায়রাখে ও স্ট্রোক প্রতিহত করে। সামুদ্রিক শৈবাল হতে এগার, কেরাজিনা এবং এলগিনেট উৎপন্ন হয় যা শিল্পকারখানায় এবং ওষুধ শিল্পে মূল্যবান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের বহুদেশে এই সামুদ্রিক শৈবাল মানুষের খাদ্যে পুষ্টিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃ তহচ্ছে। সীউইড ভালোভাবে পরিষ্কার করে তাজা অবস্থায় সালাদ হিসেবে খাওয়া যায়। যে কোন খাদ্যে অন্যান্য উপাদানের সাথে অল্পপরিমাণে হিপনিয়া শৈবাল ব্যবহার করে খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়। সামুদ্রিক শৈবাল সমৃদ্ধ খাদ্যগুলো হলো- সালাদ, সুপ, আচার, পিঠা, চানাচুর, জেলী, সস ইত্যাদি। চীন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারত এই সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। আমাদের দেশেও এই সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ ও বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট "Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas" শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় মোট ৭ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল সেন্ট-মার্টিন থেকে সংগ্রহ করে টেকনাফের প্রকল্প এলাকার নার্সারীতে জন্মানো ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

শৈবাল বিষয়ক গবেষণা পরবর্তী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত শৈবালের ২টি জাত বারি সীউইড-১ ও বারি সীউইড-২ অবমুক্ত করেছে।

বারি সীউইড-১

বারি সীউইড-২

কক্সবাজারের নুনিয়ার ছড়ায় সামুদ্রিক শৈবাল চাষ

পাহাড়ী কৃষি গবেষণা

দেশের প্রায় ১২ শতাংশ পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি কাজ সমতল ভূমির অনুরূপ নয়। বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে অস্থায়ী জুম চাষাবাদের প্রবর্তন রয়েছে। যার মাধ্যমে একদিকে যেমন জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে না অন্যদিকে ব্যাপকভাবে ভূমিধ্বসের কারণে পাহাড় সমূহের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ নিরিখে উক্ত অঞ্চলে অবস্থিত বারির গবেষণা কেন্দ্রসমূহের বিজ্ঞানীরা স্থায়ীভাবে পাহাড়ে চাষাবাদ উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ফল, সবজি ও মসলা চাষের মাধ্যমে বছরব্যাপী উৎপাদনশীল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। যা উক্ত অঞ্চলে "ম্যাথ" মডেল নামে পরিচিত। মডেলটি পাহাড়ী অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

বারি কফি-১

বারি কফি-২

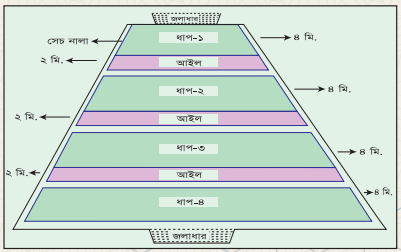

"ম্যাথ" মডেল

পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

বারি প্রযুক্তি হস্তান্তর

বারি প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগ এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, এনজিও ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজ করা হচ্ছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরে দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত খামার পদ্ধতি গবেষণা ও উন্নয়ন এলাকা এবং বহুস্থানিক গবেষণা এলাকা এবং বারি প্রযুক্তি পল্লী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, ইলেকট্রনিক্স ও প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ কর হয়। বারি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও বারি তার গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সাথে যুগপৎভাবে সহায়তা প্রদান ও গ্রহণ করে আসছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ বিগত পাঁচ দশক ধরে দেশের কৃষির উন্নয়নে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে ক্রমাগতভাবে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন ফসলের উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য সহযোগিতার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির তথ্য বিষয়ে নিয়মিত বুকলেট, লিফলেট, ম্যানুয়াল, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজলেটার, উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (প্রতি বছর প্রকাশিত), কৃষি প্রযুক্তি হাতবই (উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির তথ্যবহুল সংকলন) সহ বিভিন্ন প্রকাশনা করে থাকে।

বিএআরআই হতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনাসমূহ

পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে নিবেদিত বি এআরআই

Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com
www.bari.gov.bd

May/2025